সহজ পাঠ

জলবায়ু পরিবর্তন

প্রথম অংশ (৬ষ্ঠ-৭ম শ্রেণী)

AOSED

সহজ পাঠ

জলবায়ু পরিবর্তন

প্রথম অংশ ঃ ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণী

AOSED

সহজ পাঠ
জলবায়ু পরিবর্তন
প্রথম অংশ ঃ ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণী

পুস্তিকা প্রণয়নে

ডঃ দিলীপ কুমার দত্ত
ডঃ সুব্রত কুমার সাহা
কুশল রায়

পর্যালোচনা ও সম্পাদনা

আহসান উদ্দিন আহমেদ
আরশাদ সিদ্দিকী
তপন কুমার দাস
এ কে এম মামুনুর রশিদ
অশোক অধিকারী
সালমা রহমান
শামীম আরফীন

ব্যবস্থাপনায়

ইদ্রিস আলী শোভন
হেলেনা খাতুন
রিক্তা দত্ত
আসাদুল হক

প্রকাশনা

এ্যাওসেড (AOSED)
An Organization for Socio-Economic Development
৩১, বসুপাড়া রোড
খুলনা-৯১০০, বাংলাদেশ
ফোন ঃ ০৪১-৭২৪৩৯৭
ই-মেইল : aosed_khulna@yahoo.com

প্রকাশকাল

এপ্রিল ২০০৪

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

শামীম আরফীন
শেখর বিশ্বাস

অংকন

শেখর বিশ্বাস
মোঃ মাহফুজার রহমান
দিলীপ বিশ্বাস
প্রদ্যুৎ ভট্ট

গ্রাফিক্স ও মুদ্রণ

প্রচারণী প্রিন্টিং প্রেস
৪৪ স্যার ইকবাল রোড, খুলনা
ফোন ঃ ০৪১-৮১০৯৫৭

Implemented by AOSED
In Partnership with CARE Bangladesh RVCC Project
Financed by Canadian International Development Agency (CIDA)

ভূমিকা

গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের প্রভাবে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উত্তাপ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবর্তিত হচ্ছে জলবায়ু, বিশেষজ্ঞরা আশংঙ্কা করছেন ক্রমবর্ধমান উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে পৃথিবীব্যাপী সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে, যার ফলে উপকূলীয় নিম্নাঞ্চলের কিছু অংশ সমুদ্রের লোনাপানিতে নিমজ্জিত হতে পারে। স্বাভাবিক পরিবেশ ও জনজীবনে নেমে আসতে পারে ভয়াবহ দুর্যোগ।

বাংলাদেশ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সামান্য উঁচু ভৌগোলিক অবস্থানের একটি ব-দ্বীপ। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে আশংঙ্কা করা হচ্ছে আগামী ৫০ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের ১৫-১৭% ভূ-ভাগ সমুদ্রের লোনাপানিতে তলিয়ে যেতে পারে। উপকূলীয় বাঁধ থাকার কারণে এ ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে কম হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে নেমে আসতে পারে ভয়াবহ পরিবেশ দুর্যোগ।

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ার সাথে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জনগোষ্ঠীর খাপ-খাওয়ানোর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কেয়ার বাংলাদেশ, কানাডিয়ান আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (সিডা)'র অর্থায়নে Reducing Vulnerability to Climate Change (RVCC) প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে, যা বাংলাদেশে এ ধরণের প্রথম উদ্যোগ। এ প্রকল্পের ১৬টি সহযোগী সংস্থার মধ্যে এ্যাওসেড (AOSED) ও ডাক দিয়ে যাই (DDJ) দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এ্যাওসেড (AOSED) নির্বাচিত স্কুলসমূহের ৬ষ্ঠ-৭ম শ্রেণী ও ৮ম-৯ম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পৃথক ২টি জলবায়ু বিষয়ক সহজ পাঠ্যপুস্তিকা, ফ্লিপ চার্ট ও শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন করছে।

নির্বাচিত স্কুল ও মাদ্রাসাসমূহে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক ৮টি অধ্যায় পরিচালনার জন্য ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকদের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে এ পুস্তিকাটি প্রণীত হচ্ছে।

আশা করা যাচ্ছে নির্বাচিত স্কুলসমূহের প্রায় ৮,০০০ জন ছাত্র-ছাত্রী প্রকাশিত পুস্তিকার ৮টি অধ্যায় পাঠ সম্পন্ন করার পর তারা জলবায়ু, জলবায়ুর প্রকারভেদ, জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবর্তনের কারণ, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপখাওয়ানো বা অভিযোজন এবং পূর্বানুমান সাপেক্ষে ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা অর্জন করতে পারবে। একই সাথে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত পাঠ উপস্থাপনার জন্য যে কৌশল বা পাঠ পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে সে পদ্ধতির সাথেও ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচয় ঘটবে। যার মাধ্যমে এ পদ্ধতির গ্রহণযোগ্যতা ও পুস্তিকার বিষয়বস্তুসমূহের প্রয়োজনীয়তা এবং মাত্রা নিরূপণ করা সম্ভব হবে।

শামীম আরফীন
নির্বাহী পরিচালক
এ্যাওসেড (AOSED)

পুস্তিকাটি প্রণয়নে তৃণমূল পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায়ের বিশেষজ্ঞবৃন্দের সক্রিয় ও আন্তরিক সহযোগিতার জন্য আমরা ঋণী।

পুস্তিকা প্রণয়ন পরামর্শক দলকে সার্বক্ষণিক সহায়তা করার জন্য কেয়ার আরভিসিসি প্রকল্পের টেকনিক্যাল এডভাইজার জনাব আহসান উদ্দিন আহমেদ, এ্যাডভোকেসী কো-অডিনেটর এ কে এম মামুনুর রশিদসহ আরভিসিসি প্রকল্পের সকল পর্যায়ের কর্মীদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পর্যালোচনা ও সম্পাদনা পরিষদ সদস্য আহসান উদ্দিন আহমেদ, আরশাদ সিদ্দিকি, তপন কুমার দাস, সালমা রহমানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। পুস্তিকায় ভাষা, শব্দের বানান শুদ্ধ ও পরিমার্জন করার জন্য অভিজ্ঞ শিক্ষক বীরেন রায়, সুশান্ত কুমার সরকার, বিশিষ্ট সাহিত্যিক, প্রাক্তন উপ-পরিচালক বাংলা একাডেমী, ঢাকা, এহসান চৌধুরীর প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বারটি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও স্কুল পরিচালনা মন্ডলীর নেতৃবৃন্দকে, যারা মাঠ পর্যায়ের পর্যবেক্ষণে (ফিল্ডটেষ্ট) আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন এবং তাদের মূল্যবান সময় ও অভিমত প্রদানের মাধ্যমে পুস্তিকাকে সমৃদ্ধ করেছেন।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর খুলনা অঞ্চলের প্রাক্তন আঞ্চলিক পরিচালক আলিম উদ্দিনের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি জিল্লুর রশিদ টিপিও কেশবপুর, যশোর, আইরিন পারভীন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, কালিয়া, নড়াইল, আব্দুল হামিদ, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, কালিয়া, নড়াইল-এর প্রতি। আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক বিপ্লব রহমানকে।

দিলীপ দত্তের নেতৃত্বে তিন সদস্য বিশিষ্ট পুস্তিকা প্রণয়ন পরামর্শক দলের সকল সদস্যদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ইদ্রিস আলী শোভন, হেলেনা খাতুন, রিক্তা দত্ত ও আসাদুল হককে, যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পুস্তিকাটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছে।

পুস্তিকায় ছবি অংকনের জন্য শেখর বিশ্বাস, মোঃ মাহফুজার রহমান, দিলীপ বিশ্বাস, প্রদ্যুৎ ভট্ট এবং অক্ষর বিন্যাসে তুষার পাল, সৈয়দ শাহ্জাদ আলীকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

গভীর মমত্ব দিয়ে যারা পুস্তিকাটির চূড়ান্ত কাজ সম্পন্ন করেছেন সে মুদ্রণ কর্মীদেরকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সূচিপত্র

অধ্যায়-১	:	পরিবেশ ও প্রতিবেশ	০১
অধ্যায়-২	:	বাংলাদেশের পরিবেশ	০৫
অধ্যায়-৩	:	বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পরিবেশ	০৯
অধ্যায়-৪	:	জীববৈচিত্র্য	১৩
অধ্যায়-৫	:	পরিবেশ ও প্রতিবেশের সাথে মানুষের সম্পর্ক	১৯
অধ্যায়-৬	:	জলবায়ু ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণসমূহ	২৩
অধ্যায়-৭	:	জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়াসমূহ	৩১
অধ্যায়-৮	:	বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া ও খাপখাওয়ানোর কৌশল	৩৫

এ সহজ পাঠ প্রণয়নে আমাদের সাথে তিন সদস্যের পরামর্শক দল কাজ করেন। পরামর্শক দলের সদস্যরা হচ্ছেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ ডিসিপ্লিনের সহযোগী অধ্যাপক জনাব দিলীপ কুমার দত্ত, সহকারী অধ্যাপক জনাব সুব্রত কুমার সাহা ও শেষ বর্ষের ছাত্র কুশল রায়।

পরামর্শক দলের নিরলস প্রচেষ্টায় পুস্তিকাটির একটি খসড়া প্রণীত হয়। খসড়া প্রণয়নে পরামর্শক দলকে প্রথমেই ভাষার প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করতে হয়। বাংলা ভাষায় জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে সম-সাময়িক তথ্য-উপাত্ত হাতের কাছে না পাওয়ায় বাধ্য হয়ে ইংরেজীতেই প্রণয়ন করা হয় প্রথম খসড়া।

কেয়ার আরভিসিসি কর্মকর্তাদের সাথে ইংরেজী খসড়াটি নিয়ে পর্যালোচনা-পরামর্শের পর ব্যাপক সংযোজন, সংশোধন, পরিমার্জনপূর্বক প্রথম বাংলা খসড়াটি প্রণীত হয়। বাংলা খসড়াটি পুনরায় কেয়ার-আরভিসিসির সাথে পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনার পর পরামর্শক দল বাংলায় দ্বিতীয় খসড়া প্রণয়ন করেন।

দ্বিতীয় খসড়াটি নিয়ে খুলনায় একটি অংশগ্রহণমূলক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় শিক্ষক, শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তা, সাংবাদিক, সাহিত্যিকরা পুস্তিকাটির বিষয়ে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন। অংশগ্রহণকারীদের আলোচনা ও অভিমত অনুযায়ী পুস্তিকাটির তৃতীয় খসড়া প্রণীত হয়।

তৃতীয় খসড়াটি পর্যালোচনা ও সম্পাদনার জন্য CAMPE (গণ স্বাক্ষরতা অভিযান)-এর তপন কুমার দাসকে প্রদান করা হয়। সংশোধন ও সম্পাদনা শেষে চতুর্থ খসড়াটি কেয়ার-আরভিসিসির এডভাইজার জনাব আহসান উদ্দিন আহমেদ ও এ্যাডভোকেসি কো-অর্ডিনেটর জনাব এ কে এম মামুনুর রশিদের পরামর্শ অনুযায়ী পুস্তিকার ভাষা আরো সহজ করার জন্য অভিজ্ঞ শিক্ষক জনাব বীরেন রায় ও সুশান্ত কুমার সরকার সম্পাদনা করেন। এ পর্যায়ে পরামর্শক দল পঞ্চম খসড়াটির কাজ সম্পন্ন করেন।

পঞ্চম খসড়াটি মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষণের (ফিল্ড টেষ্ট) জন্য প্রেরণ করা হয়। খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলার দু'টি, নড়াইলের কালিয়া উপজেলার একটি, যশোরের কেশবপুর উপজেলার একটি, সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার একটি, বাগেরহাটের মোড়েলগঞ্জ উপজেলার সাতটি মোট বারটি স্কুলের বাহাত্তর জন ছাত্র-ছাত্রী এবং বার জন শিক্ষকের অভিমত ও প্রস্তাবনাসমূহ যথাযথ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা পূর্বক সংশোধন ও সংযোজন করা হয়।

পুস্তিকায় ব্যবহৃত ছবিগুলো তৃতীয় পর্যায়ের খসড়ার সাথে সম্পৃক্ত করা হয় এবং ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় ছবিগুলোও ব্যাপক সংশোধন ও পরিমার্জনপূর্বক পুস্তিকাটি চূড়ান্ত করা হয়।

অধ্যায়-১

পরিবেশ ও প্রতিবেশ

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখবো :

ক) পরিবেশ ও তার উপাদানসমূহ,

খ) প্রতিবেশ ও তার উপাদানসমূহ।

পাঠ ১.১

পরিবেশ ও তার উপাদানসমূহ

আমরা আমাদের পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে জেনেছি "আমাদের চারপাশে যা কিছু, তাই নিয়ে আমাদের পরিবেশ"। পরিবেশ বিষয়ে আমরা এ পাঠে আরো বিস্তারিত জানতে পারবো।

সূর্যের আলো ও তাপ, মাটি, পানি ও বাতাস জীবন টিকিয়ে রাখার যে উপযোগী অবস্থা তৈরী করে তাকে পরিবেশ বলে। এ উপযোগী অবস্থায় যখন গাছপালা, জীবজন্তু, অনুজীব ও মানুষ সুস্থ ও সাবলীল অবস্থায় বেড়ে ওঠে তখন তাকে সুস্থ পরিবেশ বলে। মাটি, পানি, বায়ু, আলো, তাপ, উদ্ভিদ ও প্রাণী ইত্যাদি পরিবেশের প্রধান উপাদান।

পরিবেশের প্রতিটি উপাদান পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। সূর্যের আলো, মাটি, পানি ও বাতাস গাছপালা জন্মানোর উপযোগী অবস্থা তৈরী করে। জীবজন্তু, পশুপাখি বেঁচে থাকার জন্য এসব গাছপালার উপর নির্ভর করে। মানুষকে টিকে থাকার জন্য গাছপালা, জীবজন্তু, পশুপাখির উপর নির্ভর করতে হয়। এভাবে পরিবেশের প্রতিটি উপাদানই একে অন্যের উপর নির্ভরশীল।

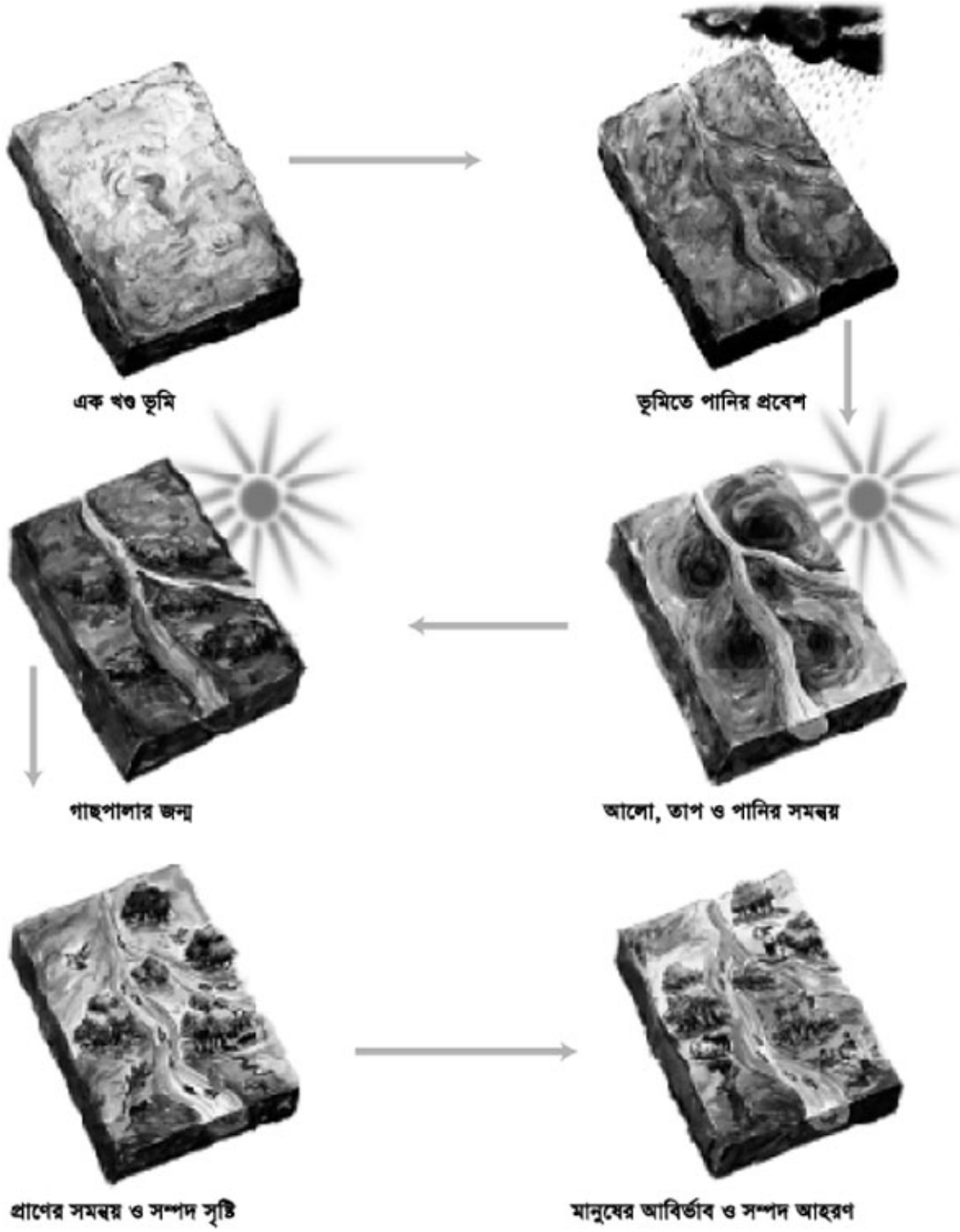

পরিবেশের উপদানগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন - জৈব উপাদান এবং অজৈব উপাদান। জৈব বা জীবিত উপাদান বলতে জীবজন্তু, গাছপালা, পশুপাখি ইত্যাদিকে বোঝায়। অজৈব বা জড় উপাদান বলতে মাটি, পানি, বাতাস ইত্যাদিকে বুঝায়। জীবিত উপাদানসমূহ জড় উপাদানসমূহের সহযোগিতায় জীবনকে টিকিয়ে রাখার মতো কার্যকর পরিস্থিতি তৈরী করে।

পাঠ ১.২

প্রতিবেশ এবং তার উপাদানসমূহ

প্রতিবেশ হলো পরিবেশের একটি অংশ যেখানে জীব ও জড় উপাদানসমূহ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ প্রতিবেশ হলো নানা ধরণের অনুজীবসহ জীবসমষ্টি ও তার আশ্রয়দানকারী জড়জগৎ যা ঐ জীবসমষ্টির টিকে থাকার শর্ত পূরণ করে। আমাদের চারপাশেও নানা ধরণের প্রতিবেশ বিদ্যমান। উদাহরণ হিসেবে যদি আমরা একটি পুকুরকে ভাবি তাহলে দেখতে পাবো পুকুরের মাটি, পানি, উদ্ভিদ, মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী ইত্যাদি মিলিয়ে একটি প্রতিবেশ তৈরী হয়েছে। তেমনি সুন্দরবনের যাবতীয় পশুপাখী, জীবজন্তু, গাছপালা, নদনদী, মাটি, পানি ইত্যাদি নিয়েও সুন্দরবনভিত্তিক একটি প্রতিবেশ তৈরী হয়েছে। প্রতিবেশের মধ্য হতে গাছপালা বা উদ্ভিদ খাদ্য উৎপাদন করে বলে এদেরকে বলা হয় উৎপাদক, আর পশুপাখি বা কীটপতঙ্গ ঐসব খাদ্য খায় বলে এদেরকে বলা হয় খাদক। প্রতিবেশে অনুজীব বা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবও এ শৃঙ্খলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এরা প্রতিবেশের মৃত জীবগুলোকে বিশ্লিষ্ট করে (পঁচিয়ে গলিয়ে) মাটিতে খাদ্যরস হিসেবে ফিরিয়ে দেয়। এদেরকে এক কথায় বলা হয় বিশ্লেষক।

প্রতিবেশে উৎপাদক, খাদক ও বিশ্লেষক একই সাথে অবস্থান করে এবং প্রত্যেকেই একটি খাদ্যচক্রে আবদ্ধ থাকে। খাদ্যচক্র প্রতিবেশ বা

পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা প্রকৃতিতে শক্তির ভারসাম্য রক্ষা করে। এ খাদ্যচক্রের প্রথম স্তরে থাকে সবুজ উদ্ভিদ (উৎপাদক)–যা মাটি থেকে খাদ্যরস ও পাতার সবুজ কণিকা ব্যবহার করে সূর্যের আলোর সাহায্যে নিজেদের খাদ্য তৈরী করে। খাদ্যচক্রের দ্বিতীয় স্তরে থাকে প্রাথমিক খাদক শ্রেণীভুক্ত ছোট প্রাণী। এরা খাবারের জন্য শুধুমাত্র সবুজ উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। খাদ্যচক্রের পরবর্তী স্তরের খাদককূল প্রাথমিক খাদক থেকে আকারে বড় এবং খাদ্যের জন্য সবুজ উদ্ভিদ ও প্রাথমিক খাদক উভয়ের উপরই নির্ভর করে। আবার খাদ্যচক্রের শেষ শ্রেণীর খাদক মানুষসহ অন্যান্য বড় বড় প্রাণীকূল যারা বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য হিসেবে ছোট ছোট প্রাণী ও উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল।

প্রতিবেশে শেষ শ্রেণীর খাদকের পরে বিশ্লেষকের (যেমন বিভিন্ন জাতের অনুজীব) অবস্থান। এরা প্রতিবেশের মৃত জীবদেহকে বিশ্লিষ্ট করে মাটিতে খাদ্যরস হিসেবে ফিরিয়ে দেয়। সবুজ উদ্ভিদ এ খাদ্যরসকে তাদের খাবার হিসেবে ব্যবহার করে। এভাবেই প্রতিবেশে একটি খাদ্যচক্র সম্পূর্ণ হয়। একটি সুষ্ঠু খাদ্যচক্র প্রতিবেশের স্বাভাবিক অবস্থা নির্দেশ করে।

প্রতিবেশের উপাদানসমূহ আবার পরিবেশের উপাদানের অনুরূপ। জড় ও জৈব উভয় উপাদানগুলোর কার্যকর আন্তসম্পর্ক জীবকে প্রতিবেশে টিকে থাকতে সাহায্য করে।

পাদটীকা :

অনুজীব : অতি ক্ষুদ্র জীব যাদের খালি চোখে দেখা যায় না।

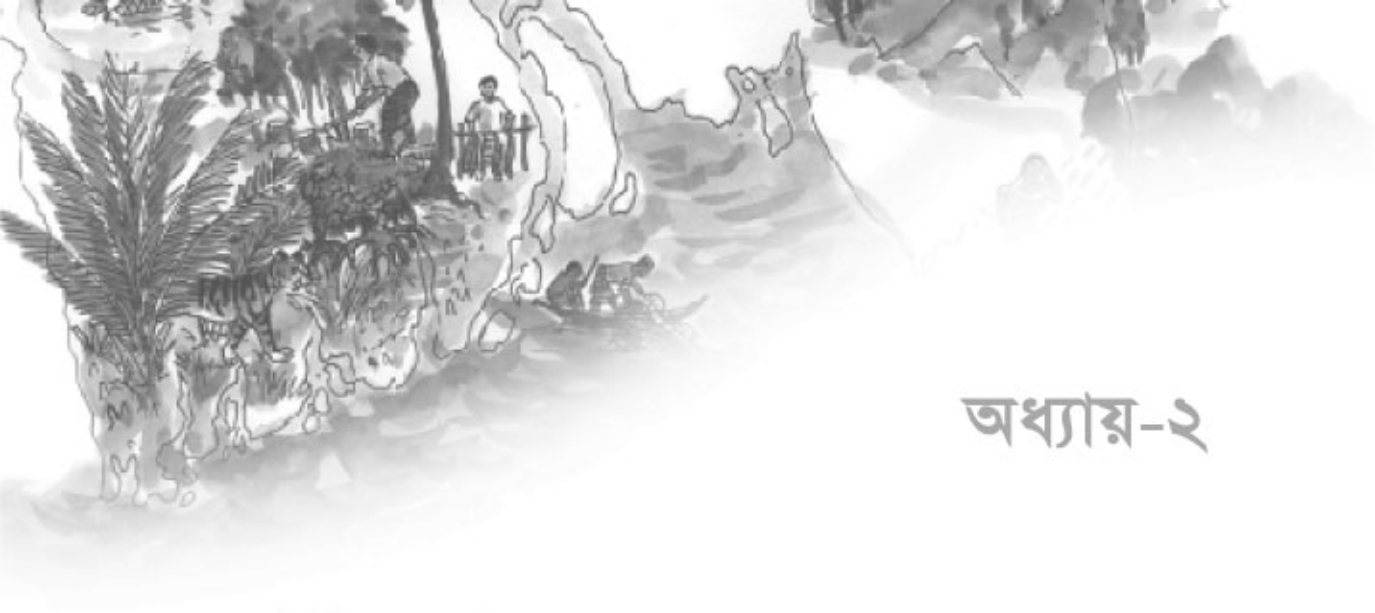

অধ্যায়-২

বাংলাদেশের পরিবেশ

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখবো :

ক) বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশ,

খ) বাংলাদেশের নদনদী, হাওড়বাওড় ও বনাঞ্চলসমূহ,

গ) বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ।

পাঠ ২.১

বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশ।

বাংলাদেশ দক্ষিণ-এশিয়ার একটি উন্নয়নশীল দেশ। যার আয়তন প্রায় ১,৪৩,৯৯৮ বর্গ কিলোমিটার। উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বাংশে কিছু উঁচু টিলাভূমি ছাড়া বাংলাদেশের বাকী অংশ গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদীর পলল দ্বারা তৈরী নিম্ন-সমতলভূমি। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশ সমুদ্রপৃষ্ঠের ৩৩ থেকে ৯৬ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। এই উচ্চতা উত্তর-পূর্বাংশে ২২ মিটার কখনও কখনও ৬০ মিটার পর্যন্ত হয়।

বাংলাদেশের পশ্চিমাংশের প্রায় মাঝখানে পাবনা, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ইত্যাদি এলাকা নিয়ে বরেন্দ্র অঞ্চল এবং টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ ইত্যাদি এলাকা নিয়ে গঠিত মধুপুর গড় অঞ্চল। নিকটস্থ পললভূমি থেকে এসব অঞ্চল কিছুটা উঁচুতে অবস্থিত। বরেন্দ্র অঞ্চলের গড়পড়তা উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪৫ মিটার এবং মধুপুর অঞ্চলের গড়পড়তা উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৮ মিটার। বাংলাদেশের

সবচেয়ে উঁচু স্থানসমূহ পার্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থিত। উঁচু পর্বতশৃঙ্গের মধ্যে মোদকমোলের উচ্চতা ১০০৩ মিটার। এছাড়া বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকা প্রধানত নিম্নাঞ্চল এবং এর উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠের এক থেকে ছয় মিটারের বেশি নয়। মাঝে মাঝে অবশ্য এই পললভূমির উচ্চতা স্থান ভেদে ১৫ থেকে ১৮ মিটার পর্যন্ত হয়।

পাঠ ২.২

নদ-নদী, হাওর-বাওড় ও বনাঞ্চলসমূহ।

বাংলাদেশকে নদীমাতৃক দেশ বলা হয়। এদেশে অসংখ্য নদ-নদী আছে এবং উল্লেখযোগ্য নদ-নদীর সংখ্যা ৭০০-এর উপর। এরা প্রধানত: পদ্মা-মেঘনা-যমুনার বিভিন্ন শাখা উপ-শাখা। বাংলাদেশের সব নদীর দৈর্ঘ্য একত্রে প্রায় ২৪,০০০ কিলোমিটার হবে। পৃথিবীর অন্যান্য যেকোন নদীর তুলনায় বাংলাদেশের পদ্মা-মেঘনা-যমুনা দিয়ে সবচাইতে বেশি পলল প্রবাহিত হয়। পানিপ্রবাহে বাংলাদেশের নদীসমূহের স্থান পৃথিবীতে তৃতীয়। দেশের প্রায় ৮০ ভাগ এলাকা পলল দ্বারা গঠিত।

বাংলাদেশে অসংখ্য জলাভূমি রয়েছে। এগুলোর মধ্যে মিঠা পানির জলাভূমি যেমন রয়েছে, তেমনি লোনা পানির জলাভূমিও রয়েছে। দেশের উত্তর-পূর্বাংশের মেঘনা অববাহিকায় প্রায় ৪৭টি বড় হাওড় এবং ৬,৩০০টি বিভিন্ন আকারের বিল রয়েছে। দেশে হাওরের মোট সংখ্যা এখনো জানা যায়নি তবে সব মিলিয়ে এদেশে ৪০০-এর উপর হাওর রয়েছে। পদ্মার ব-দ্বীপ অঞ্চল যেমন– সাতক্ষীরা, খুলনা ইত্যাদি অঞ্চল বাওড় প্রধান এলাকা।

বাংলাদেশের মোট আয়তনের প্রায় ৯ শতাংশ বনাঞ্চল। এই বনাঞ্চল পার্বত্য চট্টগ্রাম, মধুপুর গড়, সিলেট ও সুন্দরবনে সীমাবদ্ধ। এসব বনাঞ্চল তৃণভূমি থেকে পত্রমোচী এবং মিশ্র চিরহরিৎ থেকে চিরহরিৎ গাছপালা সমৃদ্ধ। সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল বিশ্বখ্যাত।

পাঠ ২.৩

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন– খনিজ জ্বালানি, ধাতব কাঁচামাল এবং অ-ধাতব কাঁচামাল।

খনিজ জ্বালানির মধ্যে প্রধানত: প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা ও পিট কয়লা রয়েছে। বাংলাদেশের সিলেট, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচুর প্রাকৃতিক গ্যাস আছে। সিলেটে কয়লা ও বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে পিট কয়লা পাওয়া যায়। ধাতব কাঁচামাল হিসাবে বাংলাদেশের রংপুর অঞ্চলে কিছু খনিজের সন্ধান পাওয়া গেছে যা থেকে তামা ও দস্তা পাওয়া যেতে পারে। তবে বর্তমান অবস্থায় এগুলোর উত্তোলন আর্থিকভাবে লাভজনক নয়। অ-ধাতব কাঁচামালের মধ্যে চুনাপাথর, কঠিন শিলা, চিনামাটি, কাঁচবালু ও

খনিজ বালু উল্লেখযোগ্য। এসব সিলেট, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজারের সৈকত অঞ্চলে পাওয়া যায়। বাংলাদেশের ভূগর্ভস্থ পানিও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ।
বাংলাদেশ পললসমৃদ্ধ হওয়ায় এবং এর আবহাওয়া গ্রীষ্মমণ্ডলীয় নাতিশীতোষ্ণ হওয়ায় বাংলাদেশে সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য রয়েছে। এটাকেও প্রাকৃতিক সম্পদ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

পাদটীকা :

টিলাভূমি = সমতল থেকে হঠাৎ উঁচু যাওয়া ভূমিরূপ।
পলল = নদীবাহিত ভাসমান পদার্থসমূহ।
সমুদ্রপৃষ্ঠ = মহাসাগরীয় পৃষ্ঠ, যা শূন্যসম উচ্চতা নির্দেশ করে।
হাওর = পলল ভূমির নিম্নমণ্ডল যেখানে সারাবছরই কম-বেশি পানি থাকে।
বাওড় = পানি আছে এমন নদীর পরিত্যাক্ত গতিপথ।
পত্রমোচী = বছরের বিশেষ সময়ে যেসব গাছের পাতা ঝরে যায়।
চিরহরিৎ = যে সব গাছে সারা বছরই সবুজ পাতা থাকে।
ম্যানগ্রোভ = লবণসহিষ্ণু, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এবং উপ-গ্রীষ্মমণ্ডলীয় জোয়ার-ভাটা এলাকার বনাঞ্চল বিশেষ।
ব-দ্বীপ = নিম্নপ্রবাহে নদী উর্ধ্বগতি হতে পরিবাহিত পলি, বালি, কাদা প্রভৃতি মোহনার মুখে স্তরে স্তরে সঞ্চিত করে, নতুন ভূখণ্ড গঠন করে, একে ব-দ্বীপ বলে।

অধ্যায়-৩

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পরিবেশ

এই অধ্যায়ে আমরা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পরিবেশ সম্পর্কে যা যা শিখবো:

ক) বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ভূ-প্রাকৃতিক বর্ণনা

খ) সুন্দরবনের ভূমিরূপ।

পাঠ ৩.১

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ভূ-প্রাকৃতিক বর্ণনা।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল প্রধানত যশোর, নড়াইল, সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট এবং পার্শ্ববর্তী জেলাগুলো নিয়ে গঠিত। এই জেলাগুলি দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত বলে এ অঞ্চলকে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল বলা হয়। এটি মূলত পদ্মার (গঙ্গা নদীর বাংলাদেশ অংশের নাম) ব-দ্বীপ অঞ্চল। এ অঞ্চল প্রধানত সমতল ভূমি এবং বঙ্গোপসাগরের খুবই কাছাকাছি অবস্থিত। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল সমুদ্রপৃষ্ঠের গড় উচ্চতার মাত্র তিন মিটারের মধ্যে অবস্থিত এবং নদ-নদীর সংখ্যা অনেক। এসব নদীতে জোয়ার-ভাটা হয়। এ অঞ্চলের ভূমি গঠনে নদীর ভূমিকাই প্রধান। বিজ্ঞানীরা বলেন এ এলাকার ভূ-ভাগ এক সময়ে সাগরের নিচে নিমজ্জিত ছিল। উজান থেকে (গঙ্গাবাহিত) পানির সাথে বিভিন্ন জৈব ও অজৈব

পদার্থ ভেসে আসে। এগুলো সমুদ্রের জোয়ারে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে পুনরায় ফিরে আসে এবং জলমগ্ন নিম্নাঞ্চলে পতিত হতে থাকে দীর্ঘকাল ধরে এই প্রক্রিয়ায় নিচুভূমি একটু একটু করে উঁচু হতে হতে স্থলভূমিতে পরিণত হয়েছে। এ অঞ্চলের ভূমি গঠনে সমুদ্রের জোয়ার এবং নদীবাহিত পলল প্রধান ভূমিকা পালন করে। যে কারণে এ অঞ্চল দেশের অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা উর্বর ও বিভিন্ন প্রকার জৈব ও অজৈব পদার্থসমৃদ্ধ। সমুদ্রের জোয়ারে একের পর এক পললের আস্তরণ পড়ায় এ অঞ্চল বৈচিত্র্যহীন সমতলভূমি যা সমুদ্রের দিকে ক্রমশঃ ঢালু। নদীবাহিত পলল দিয়ে গঠিত এ ব-দ্বীপ অঞ্চলে রয়েছে অসংখ্য ছোট বড় নদ-নদী। যা শুধু ভূমি গঠন প্রক্রিয়ায় নয়, ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধিতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

উর্বর এ এলাকার কৃষি ব্যবস্থায় নদ-নদীর ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্গোপসাগরের নিকটবর্তী হওয়ায় ও সুন্দরবনের প্রভাবে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদ-নদীসমূহ মৎস্য সম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এ অঞ্চলে গঙ্গার তিনটি প্রধান শাখা নদী প্রবাহিত, শাখা নদ-নদীগুলো হচ্ছে– ভৈরব, মাথাভাঙ্গা ও গড়াই বা মধুমতি। ভৈরবের প্রধান শাখা নদীগুলোর মধ্যে রয়েছে ইছামতি, হাড়িয়াভাঙ্গা, রায়মঙ্গল, কপোতাক্ষ, খোলপটুয়া প্রভৃতি। মাথাভাঙ্গার প্রধান প্রধান শাখা হচ্ছে চূর্ণ, চিত্রা, নবগঙ্গা, কুমার ইত্যাদি। গড়াই বা মধুমতির প্রধান শাখাগুলো হচ্ছে কালিগঙ্গা, কাজীবাছা, পশুর, আত্রাই, বলেশ্বর, হরিণটানা প্রভৃতি। এ অঞ্চলের অন্যান্য বড় নদীগুলোর মধ্যে শিবসা, আড়পাঙশিয়া, আড়ুয়াশিবসা, বলেশ্বর, ভোলা, ভাংড়া, চালকী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

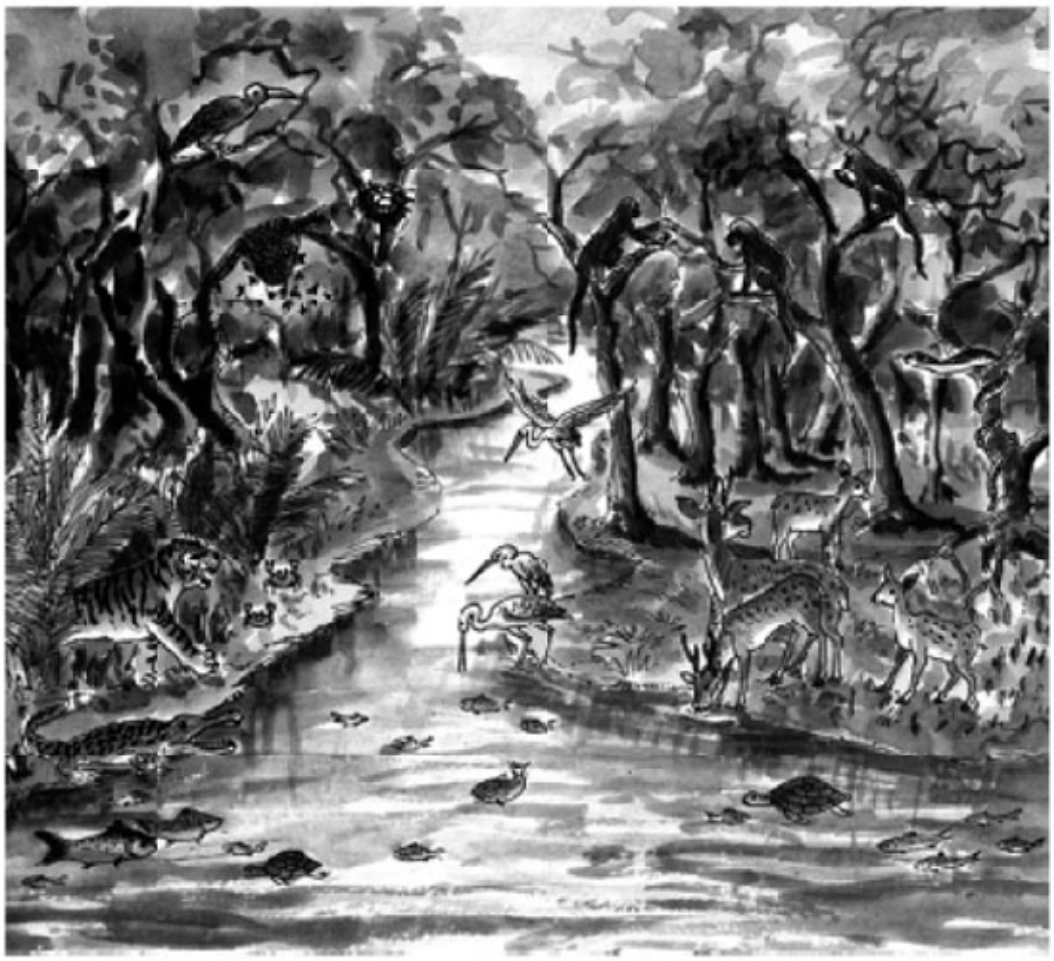

সম্প্রতি সময়ে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদ-নদীতে উজানের প্রবাহ কমে যাওয়ায় পললপ্রবাহও কমে গেছে। তাছাড়া উপকূলীয় বাঁধের কারণে গত প্রায় তিন দশকের বেশি সময় ধরে উজানের প্রবাহিত পলল মূলভূমির পরিবর্তে নদীর বুকেই জমা হচ্ছে, ফলে নদীগুলো ভরাট হয়ে মরে যাচ্ছে। এ দুটি

কারণে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ভূমি গঠনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে। এই অঞ্চলের ভূমি গঠন প্রক্রিয়ায় এখন আর নদীবাহিত পলল তেমন কোন ভূমিকা রাখছে না। যে কারণে এই ভূমিকে এখন নিষ্ক্রিয় ব-দ্বীপ বলা যেতে পারে। আবার এ অঞ্চলে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় পরিমাণ পলল জমা হয়নি বিধায় এ অঞ্চলকে অপরিণত ব-দ্বীপ অঞ্চলও বলা যেতে পারে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল ঘেঁষে সুন্দরবন অবস্থিত। সমুদ্রের পাড়ে লোনা পানি ঘেরা এ বনভূমিকে ম্যানগ্রোভ বন বলা হয়।

পাঠ ৩.২

সুন্দরবনের ভূমিরূপ।

সুন্দরবন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় তিনটি ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের মধ্যে অন্যতম। এর আয়তন প্রায় ৫,৭৭,০০০ হেক্টর (অন্য দুটি বৃহৎ ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল হলো ৪,৯৫,২০০ হেক্টর বিস্তৃত ভেনিজুয়েলার ওরিনীকো নদীর ব-দ্বীপ এবং ১১,৩৩,৩০০ হেক্টর বিস্তৃত নাইজার নদীর ব-দ্বীপ)। পৃথিবীর অন্যান্য ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের তুলনায় সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য অনেক বেশি। এ বন থেকে আহরিত কাঠ ও জ্বালানিসহ বিভিন্ন বনজ সম্পদ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সুন্দরবনের পার্শ্ববর্তী প্রায় ৩৫ লক্ষ মানুষের জীবিকার যোগান দেয়।

সুন্দরবনের ভূ-ভাগ দেশের অন্যান্য এলাকা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। প্রতিদিন দু'বেলা জোয়ার-ভাটা এ বনভূমিকে প্লাবিত করে। সুন্দরবনের মাটি লবণাক্ত, দোআঁশ ও পলিযুক্ত, কোথাও কোথাও বেলে, আবার কোথাও কোথাও নরম কাদাযুক্ত। এই বনাঞ্চলের মাটি জৈব (হিউমাস) ও অজৈব উপাদান সমৃদ্ধ, উর্বর, কালচে বাদামি বর্ণের। সুন্দরবনের বাৎসরিক গড় তাপমাত্রা ২৪° সে. এর বেশি এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বছরে প্রায় ১৬০০ মিলিমিটার। তাই সুন্দরবন গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আর্দ্র বনাঞ্চল। তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত দুটোই ঋতুভিত্তিক। শীত ঋতুতে বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রা কম হয় এবং বর্ষায় বৃষ্টিপাত ৬০০ মিলিমিটার পর্যন্ত হয়।

সুন্দরবন মূলত: কর্দমাক্ত ও অতিমাত্রায় উৎপাদনশীল এবং স্থানভেদে বিভিন্ন মাত্রায় লবণাক্ত। ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় সাড়ে চারশ নদ-নদী, খাল সুন্দরবনে জালের মতো বিছিয়ে রয়েছে। সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত পশুর নদী সবচেয়ে বড়। এছাড়া শিবসা, আড়পাঙশিয়া, আড়ুয়াশিবসা, বলেশ্বর, ভোলা, ভাংড়া, চালকী ইত্যাদিসহ প্রায় ১৮ থেকে ২০টি বড় নদী বয়ে চলেছে সুন্দরবনের বুক চিরে। এসব নদ-নদী জোয়ার-ভাটায় সুন্দরবনকে প্লাবিত করে।

পাদটীকা :

নিষ্ক্রিয় (নিষ্ক্রিয় ব-দ্বীপ) = যেখানে ভূমি গঠন প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেছে।
অবরুদ্ধ = বাধাপ্রাপ্ত।
গাঙ্গেয় = গঙ্গা নদী বিষয়ক।

অধ্যায়-৪

জীববৈচিত্র্য

এ অধ্যায়ে আমরা জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে যা জানতে পারবো:

ক) জীববৈচিত্র্য ও তার গুরুত্ব,

খ) বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য,

গ) বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জীববৈচিত্র্য।

পাঠ ৪.১

জীববৈচিত্র্য ও তার গুরুত্ব।

জীববৈচিত্র্য বলতে বিভিন্ন প্রজাতির জীবের বিচিত্রতাকে বুঝায়। কোন অঞ্চলের পরিবেশ ও প্রতিবেশিক অবস্থার উপর নির্ভর করে ঐ অঞ্চলের উদ্ভিদ, প্রাণী ও অনুজীবের ধরন, সংখ্যা ও জাত-প্রজাতি ইত্যাদি। যেমন সুন্দরবনে যে ধরনের প্রাণী বা উদ্ভিদের সমাহার লক্ষ্য করা যায় পৃথিবীর অন্য কোন বনাঞ্চলে তার সাক্ষাৎ নাও মিলতে পারে। উদাহরণ হিসেবে আমরা সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগারের কথা বলতে পারি, যা পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই। আবার একইভাবে পাহাড়ি পরিবেশে যে সকল উদ্ভিদ জীবজন্তু পাওয়া যায় তা সুন্দরবনে নেই। প্রতিটি জাতের মধ্যে আবার বিভিন্নতা রয়েছে যেমন সুন্দরবনে যে হরিণ বাস করে তাকে চিত্রল হরিণ বলে, পাহাড়ি এলাকায় পাওয়া যায় সাম্বার হরিণ, সাধারণ বনাঞ্চলে পাওয়া যায় মায়া হরিণ। ভিন্ন পরিবেশ ও প্রতিবেশিক অবস্থায় রয়েছে ভিন্ন প্রজাতির

হরিণ। এদের শরীরের গঠন, রং, খাদ্যাভ্যাসও ভিন্ন। একইভাবে উদ্ভিদ, ফল-মূল, পাখি, উভচর, সরীসৃপ, স্তন্যপায়ী প্রাণীর ভিন্ন ভিন্ন জাত ও প্রজাতি রয়েছে। নানা প্রজাতির জীবের এ সমাহার বা বিচিত্রতাই "জীববৈচিত্র্য"।

ক) জীববৈচিত্র্য পরিবেশের একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শর্ত। এ শর্তের উপর পরিবেশের গুণগতমান নির্ভর করে।

খ) কোন অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য কমে গেলে বা হ্রাস পেলে সে অঞ্চলের পরিবেশ-প্রতিবেশের বিপর্যয় ঘটে, ফলে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠিই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

গ) জীববৈচিত্র্যের উপযোগী গুণাবলী যেমন আছে তেমনি তার অন্তর্নিহিত গুণাবলীও রয়েছে। জীববৈচিত্র্য খাদ্য, ঔষধি, জ্বালানি ইত্যাদির সরবরাহ যেমন নিশ্চিত করে তেমনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও প্রকাশ করে। জীববৈচিত্র্য প্রাকৃতিক গূঢ় রহস্যের আঁধার। পৃথিবীর অনেক দেশেই জীববৈচিত্র্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল প্রেরণা দান করে।

পাঠ ৪.২

বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য।

বাংলাদেশের জলাভূমি ও বনাঞ্চলে যথেষ্ট জীববৈচিত্র্য রয়েছে। আমাদের দেশের প্রায় পাঁচ হাজার প্রজাতির সপুষ্পক উদ্ভিদ, ৭৫০ প্রজাতির পাখি, ১৫০ প্রজাতির বেশি জলজ পাখি, ৫০০ প্রজাতির

বেশি মাছ, ১২৫ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী, ১২৪ প্রজাতির সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী এবং ১৯ প্রজাতির উভচর প্রাণী পাওয়া যায়। কিন্তু এসব প্রজাতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বর্তমানে বিপন্ন অথবা আশঙ্কাজনক অবস্থায় আছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী তালিকাভুক্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে প্রায় ৫০ প্রজাতি বর্তমানে বিলুপ্ত হয়ে গেছে অথবা ভীষণভাবে বিপন্ন। প্রায় ২৫০ প্রজাতির পাখি বিপদাপন্ন অবস্থায় আছে এবং খুব দ্রুত এদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। এছাড়া প্রায় ২৭ প্রজাতির উদ্ভিদ এখন বিপন্ন অবস্থায় আছে। বাংলাদেশে প্রায় ৫৫ পরিবারভুক্ত ২৬০ প্রজাতির মাছ (ফিন ফিস), প্রায় ৬৩ প্রজাতির চিংড়ি ও প্রায় ৩১ প্রজাতির কচ্ছপ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে অনেক ধরনের মাছ ও কচ্ছপ বর্তমানে বিলুপ্তির পথে।

পাঠ ৪.৩

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জীববৈচিত্র্য।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে তেমন আলাদা কিছু জানা যায় না। তবে এ অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল যা সুন্দরবন নামে পরিচিত তার জীববৈচিত্র্যের একটি নমুনা এখানে উপস্থাপন করা হলো।

বিভিন্ন ধরনের বৃক্ষ, গুল্ম, ঘাস, ইপিফাইটস (পরজীবী গুল্ম, যেমন অর্কিড), স্তন্যপায়ী, সরীসৃপ, উভচর

গোলপাতা

সুন্দরী গাছ

প্রাণী ও পাখি ইত্যাদির বিচরণ ক্ষেত্র হিসাবে সুন্দরবনের বিশেষ নাম রয়েছে। সুন্দরবনের সংরক্ষিত বনাঞ্চলে প্রায় ৩৩০ প্রজাতির বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ পাওয়া যায়। বিশ্বখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রল হরিণসহ প্রায় ৪২ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী, ৩৫ প্রজাতির সরীসৃপ এবং ৯ প্রজাতির উভচর প্রাণী আছে। মদনটাক, হাড়গিলা, দুষ্প্রাপ্য সাদাপেট সমুদ্র ঈগলসহ প্রায় ২৭০ প্রজাতির পাখিও সুন্দরবনে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে প্রায় ১০০ প্রজাতির জলজ পাখি রয়েছে যাদের প্রায় অর্ধেক ভাগ অতিথি পাখি হিসেবে পরিচিত। এরা শীতে এখানে আসে এবং গ্রীষ্মে চলে যায়। চিংড়ির কয়েক'শ প্রজাতির মাছের আবাসস্থল সুন্দরবন। এখানে ২৭ পরিবারভুক্ত প্রায় ৫৩ প্রজাতির সমুদ্রচর মাছ, ৪৯ পরিবারভুক্ত প্রায় ১২৪ প্রজাতির তলদেশবিহারী মাছ, ৫ পরিবারভুক্ত প্রায় ২৪ প্রজাতির চিংড়ি এবং ৮ প্রজাতির গলদা পাওয়া যায়। ৭ প্রজাতির কাঁকড়া ও তিন প্রজাতির কচ্ছপ পাওয়া যায়।

ইতোমধ্যেই বিভিন্ন কারণে সুন্দরবন থেকে অনেক প্রাণী ও গাছ-পালা বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং বর্তমানে বেশ কিছু প্রাণী ও গাছ-পালা বিলুপ্তির পথে।

প্রজাতি	*বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতির সংখ্যা*
উভচর	২
সরীসৃপ	১৪
পাখি	২৫
স্তন্যপায়ী	৫

প্রধানত যেসব কারণে এই প্রাণী ও উদ্ভিদের বিলুপ্তি ঘটছে সেগুলো হলো :

- অধিকাংশ ক্ষেত্রে জলাভূমিসমূহ বিনাশের মাধ্যমে প্রাণীর স্বাভাবিক বাসস্থান ধ্বংস এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এদের অবারিত চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি ;
- কৃষি ও বসতি স্থাপনের মাধ্যমে বনাঞ্চলসমূহ ধ্বংস ;
- জ্বালানি হিসাবে গাছ-গাছালির অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার এবং অনিয়ন্ত্রিত নির্মাণকাজের ফলে সংকুচিত বনাঞ্চল। এতে প্রাণীকূলের স্বাভাবিক বাসস্থানও সংকুচিত হচ্ছে ;
- কোন বিশেষ সম্পদ যেমন ঔষধিবৃক্ষ, বাঁশ, বেত ইত্যাদির অতি-আহরণ ;
- অতিমাত্রায় বন্য প্রাণী নিধন। বৈচিত্র্যহীন চাষাবাদের ফলে মাটিতে কৃষিজ রাসায়নিক পদার্থের বৃদ্ধি ;
- ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবনে মিঠাপানির প্রবাহ হ্রাসের ফলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি ;

পাদটীকা :

গূঢ় রহস্যের আধার = অনেক জানা অজানা বিষয় রয়েছে।
নিঃসরণ = চুঁইয়ে পড়া।
অন্তর্নিহিত = গভীরে অবস্থিত।
ইপিফাইটস = যেসব গাছ ভূমি থেকে উপরে অন্য গাছে জন্মায়।
গুল্ম = লতাপাতা, ঝোপঝাড়।
স্তন্যপায়ী = যেসব প্রাণী মায়ের দুধ পান করে। মানুষ, গরু, হরিণ ..... ইত্যাদি।
সরীসৃপ = শীতল রক্তের মেরুদণ্ডী প্রাণী যারা হামাগুড়ি দিয়ে চলে, যেমন– সাপ, কুমির, টিকটিকি ইত্যাদি।
উভচর = যা জলেও চরে স্থলেও চরে।

অধ্যায়-৫

পরিবেশ ও প্রতিবেশের সাথে মানুষের সম্পর্ক

-এ অধ্যায়ে আমরা পরিবেশ ও প্রতিবেশে মানুষের অবস্থান সম্পর্কে যা শিখবো:

ক) পরিবেশ ও প্রতিবেশের সাথে মানুষের সম্পর্ক,

খ) প্রতিবেশনির্ভর জীবিকা,

গ) পরিবেশ ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক চর্চা।

পাঠ ৫.১

পরিবেশ ও প্রতিবেশের সাথে মানুষের সম্পর্ক।

পরিবেশের সাথে মানুষের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ। মানুষ প্রকৃতিরই অংশ। প্রাকৃতিক নিয়ম অনুয়ায়ী প্রকৃতি বা পরিবেশ প্রত্যেকটি জীবের নিয়ন্ত্রক। এককোষী জীব থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রত্যেকটি উদ্ভিদ ও প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে। মানুষও সাধারণভাবে তার ব্যতিক্রম নয়। উদ্ভিদ ও প্রাণীর মত পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে মানুষেরও সৃষ্টি হয়েছে। তাই মানুষ ও পরিবেশের মধ্যে সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। মানুষ তার সম্পূর্ণ জীবনাচরণের জন্য পরিবেশের উপর নির্ভরশীল।

প্রতিবেশে মানুষ হলো অন্যতম ভোক্তা। প্রাণীজগত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সবুজ উদ্ভিদের উপর

নির্ভরশীল। উদ্ভিদকূলও কোন কোন বিষয়ে, যেমন– পরাগায়ন বা ফলের বিস্তারে, প্রাণীকূলের সাহায্য নেয়। এদিকে উদ্ভিদ ও প্রাণীজগত প্রতিবেশের জড় উপাদানের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। এই পারস্পরিক নির্ভরতায় জীবজগতের অস্তিত্বের জন্য এক কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে ওঠে এবং প্রতিবেশ টিকে থাকে। প্রতিবেশ টিকে থাকার জন্য প্রতিবেশের উপাদানগুলোর ভারসাম্য রক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ভারসাম্য নষ্ট হলে মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে। তাই মানুষের সাথে পরিবেশের সম্পর্ক হওয়া উচিত সমঝোতামূলক।

পাঠ ৫.২

প্রতিবেশ নির্ভর জীবিকা।

বিবর্তনের প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে বর্তমানে উন্নত পর্যায়ের সব স্তরেই মানুষ তার জীবিকার জন্যে প্রতিবেশের উপর নির্ভরশীল। জীবনযাত্রার প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষ ছিল শিকারী ও খাদ্য সংগ্রাহক। তখন তাদের জীবনযাত্রা ছিল অন্যান্য পশুর মতই। প্রধান খাদ্য ছিল ফলমূল ও কাঁচা মাংস। ধীরে ধীরে মানুষ সংস্কৃতিগত দিক থেকে সমৃদ্ধ হতে থাকে এবং চাষী ও পশুপালনকারী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

পশুপালন ও কৃষিকাজ একে অপরের সাথে যুক্ত। এগুলো মানুষকে বন্য অবস্থা থেকে সুরক্ষিত জীবিকার সন্ধান দেয়। এর ফলে প্রতিবেশের নির্দিষ্ট কিছু উপাদানের প্রতি মানুষ বিশেষভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। প্রতিবেশের উপর মানুষের এই নির্ভরশীল প্রবণতা বর্তমানেও বিরাজমান।

পৃথিবীব্যাপী এখন পর্যন্ত তালিকাভুক্ত প্রায় ২,৫০,০০০ প্রজাতির সপুষ্পক উদ্ভিদের প্রায় ৩০০০ প্রজাতির উদ্ভিদ মানুষ খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে। এই ৩০০০ প্রজাতির উদ্ভিদের মধ্যে মাত্র ২০০ প্রজাতি মানুষ চাষ করে এবং তার মাত্র ১৫ থেকে ২০টি প্রজাতি অর্থনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। কিছু ক্ষেত্রে প্রতিটি প্রজাতির মধ্যে বিচিত্রতা লক্ষণীয়। যেমন এই অঞ্চলে প্রায় ৫০,০০০ প্রজাতির ধান রয়েছে (কারো কারো মতে যা প্রায় ২,০০,০০০ প্রজাতির)। প্রায় ২৫ প্রজাতির গরু, ৪০ প্রজাতির মেষ এবং ২০ প্রজাতির ছাগল আমাদের উপমহাদেশে পাওয়া যায়। এই বিচিত্র সম্পদ মানুষের জীবিকার সহায় এবং প্রতিবেশের দান।

পাঠ ৫.৩

পরিবেশ ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক চর্চা।

পরিবেশ ও সমাজ-সংস্কৃতি নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ। পরিবেশের সাথে মানুষের সম্পর্ক প্রায় দশ লক্ষ বছরের পুরনো। এই দীর্ঘ সময়ে মানুষ পরিবেশ থেকে নিয়ত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে এবং নিজের সমাজ ও অর্থনীতি গড়ে তুলেছে, ব্যাপক অর্থে মানবিক গুণাবলী অর্জন করেছে। এই মানবিক গুণাবলীর সমাহারই হলো সংস্কৃতি। এখানে লক্ষণীয় যে, পরিবেশগত কারণে মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতি ভিন্ন হয়। যে পরিবেশে মানুষ বড় হয়, খাদ্য-বস্ত্র-পানীয়ের সংস্থান করে এবং যার উপাদানে মানুষ নতুন উপকরণ গড়ে সেই স্থানের পরিবেশের বিভিন্নতা মানুষের মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য সূচনা করে।

পাদটীকা ঃ

পরাগায়ণ = ফুলের পরাগরেণু গর্ভদণ্ডে স্থানান্তরের প্রক্রিয়া।

বিবর্তন = প্রাকৃতিক নিয়মে অতিধীর গতিতে জীবের গাঠনিক পরিবর্তন।

সংস্কৃতি = মানুষের আচার আচরণ, অভ্যাস এবং মূল্যবোধের সামাজিক রূপ।

সপুষ্পক উদ্ভিদ = যেসব উদ্ভিদের ফুল হয়।

অধ্যায়-৬

জলবায়ু ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণসমূহ

এ অধ্যায়ে আমরা জলবায়ু সম্পর্কে যা শিখবো:

ক) আবহাওয়া ও জলবায়ু কি ?

খ) জলবায়ু পরিবর্তন,

গ) জলবায়ু পরিবর্তনের প্রাকৃতিক কারণসমূহ,

ঘ) জলবায়ু পরিবর্তনে মানুষ- প্রভাবিত কারণসমূহ।

পাঠ ৬.১

আবহাওয়া ও জলবায়ু কি ?

একটি নির্দিষ্ট স্থানের বায়ুমণ্ডলের উপাদানসমূহের স্বল্প কয়েকদিনের গড় বা ১ থেকে ৭ দিনের গড় ফলকে আবহাওয়া বলে। বায়ুমণ্ডলের উপাদান বলতে বায়ুর তাপ, বায়ুর চাপ, বায়ু প্রবাহের দিক ও তার গতিবেগ, বায়ুর আর্দ্রতা, মেঘের পরিমাণ ও মেঘের প্রকারভেদ ও বৃষ্টিপাত ইত্যাদিকে বোঝায়। ধরা যাক আষাঢ় বা শ্রাবণ মাসের কয়েক দিনের আবহাওয়া বার্তা দৈনিক পত্রিকায় যেভাবে প্রকাশিত হবে–

দিন	আবহাওয়া
শনিবার	তাপমাত্রা ৩২-৩৩° সে. বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা কম, বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ৯০ শতাংশ। (এ রকম একটা দিনে খুব গরম লাগবে ও ঘাম হবে প্রচুর।)
রবিবার	তাপমাত্রা ৩০-৩২° সে. থেমে থেমে বৃষ্টিপাত হবে, বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ ৯৫ শতাংশ। (এ রকম দিনে ঘাম কম হবে, গরম কম অনুভূত হবে)
সোমবার	তাপমাত্রা ২৫-২৮° সে. অঝোর ধারায় বৃষ্টি হবে, বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ ৯৫ শতাংশ। (এ রকম দিনে ঘাম হবে না।)

দিনগুলোর এ রকম অবস্থার সাথে আমাদের পরিচয় আছে। এই যে, একেকদিন একেকরকম তাপমাত্রা বা বৃষ্টিপাত ইত্যাদিকে আবহাওয়া বলে। আবার শীতকালে, যথা পৌষ বা মাঘ মাসের দিনগুলোর অবস্থা অন্য রকম হবে। অপরদিকে গ্রীষ্মে, যেমন– বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসে ঝড়-বৃষ্টি হবে। বছরের একেক ঋতুতে আবহাওয়া একেক ধরনের হয়।

কোন স্থানের বা অঞ্চলের দীর্ঘকালের (৩০ বছর বা বেশি সময়ের) দৈনন্দিন আবহাওয়ার পর্যালোচনা করে বায়ুমণ্ডলের ভৌত উপাদানগুলোর যে সাধারণ অবস্থা দেখা যায় তাকে ঐ স্থানের বা অঞ্চলের জলবায়ু বলে।

তাই আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য স্থানের ও কালের। এক কথায় স্বল্প স্থানে, স্বল্প কালব্যাপী বায়ুমন্ডলের অবস্থাকে আবহাওয়া বলে। বিস্তৃত এলাকার দীর্ঘকালব্যাপী বায়ুমণ্ডলের সমষ্টিগত অবস্থাকে জলবায়ু বলে।

পাঠ ৬.২

জলবায়ু পরিবর্তন।

আবহাওয়ার মতো জলবায়ুও সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হতে পারে। বিজ্ঞানীদের মতে, বহুকাল আগে থেকেই জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটে চলেছে। যেহেতু জলবায়ুর উপর ভিত্তি করেই অঞ্চলভিত্তিক মানুষের জীবন-যাপনের পদ্ধতি গড়ে ওঠে, তাই জলবায়ুর পরিবর্তন সম্পর্কে আমাদের ধারণা রাখা অত্যন্ত জরুরি।

কোন স্থানের জলবায়ু বিভিন্ন কারণে পরিবর্তিত হতে পারে। এসব কারণকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

যথা : ১। প্রাকৃতিক কারণ
২। মনুষ্যসৃষ্ট কারণ

পাঠ ৬.৩

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রাকৃতিক কারণসমূহ।

পৃথিবীর সকল শক্তির মূলেই রয়েছে সূর্য। সূর্যের আলো ও তাপ পৃথিবীর সকল প্রাণীর জীবনধারণে সাহায্য করে। পৃথিবীতে প্রতিদিন যে সূর্যকিরণ পৌঁছায়, ভূপৃষ্ঠ তা শোষণ করে। শোষিত সূর্যকিরণ আবার মহাশূন্যে বিকিরিত বা প্রতিফলিত হয়। এটাই প্রাকৃতিক নিয়ম। প্রাকৃতিক নিয়মের এই শোষণ-বিকিরণ প্রক্রিয়ায় কোন ধরনের বাধা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলেই জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটে।

প্রকৃতিতে বেশ কিছু গ্যাস রয়েছে যাদের তাপ ধারণ ক্ষমতা বেশি অর্থাৎ প্রাকৃতিক ঐ গ্যাসগুলি তাপ শোষণ করে এবং শোষিত তাপ সংরক্ষণ করে। যেসব গ্যাসের তাপ ধারণ ক্ষমতা বেশি তাদের গ্রিনহাউস গ্যাস বলে (যেমন– জলীয়বাষ্প, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, ওজন, মিথেন এবং নাইট্রাস অক্সাইড ইত্যাদি)। প্রাকৃতিকভাবে এই গ্যাস পৃথিবীপৃষ্ঠে বা বায়ুমণ্ডলে নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপ ধরে রাখে এবং বায়ুমণ্ডলকে উষ্ণ রাখে। বায়ুমণ্ডলে এসব গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণের উপর নির্ভর করে পৃথিবীর উষ্ণতার তারতম্য ঘটে।

প্রাকৃতিকভাবেই প্রতি ১১ বছর পরপর প্রতিফলিত সূর্যকিরণের তারতম্য ঘটে প্রায় ০.১ শতাংশ। এই তাপ বিকিরণের তারতম্য জলবায়ু পরিবর্তনে প্রভাব ফেলে। আমরা জানি সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী তার চারপাশে ঘোরে। সূর্যের চারপাশে ঘোরার সময় পৃথিবীর অবস্থান সর্বদা সমান থাকে না, সে কারণে

পৃথিবীপৃষ্ঠের একেক অঞ্চল একেকভাবে উষ্ণ হয়। পৃথিবীর অবস্থানের এই তারতম্যের জন্য, পৃথিবীপৃষ্ঠের সূর্যের আলো সব সময় সমানভাবে পৌছায় না।

মোট কথা, পৃথিবীপৃষ্ঠে যে সূর্যকিরণ প্রবেশ করে তার প্রতিফলিত ও শোষিত অংশের মধ্যে সাম্য বজায় থাকে। এতে গভীর সমুদ্রের তাপ ধারণ ক্ষমতা ও পৃথিবীপৃষ্ঠে বরফের আচ্ছাদনের একটি গতিশীল সমন্বয় বিদ্যমান। পৃথিবীর এই তাপ বিকিরণের সাম্যতা পৃথিবীপৃষ্ঠের জলমণ্ডল, সমুদ্র স্রোত এবং বায়ু সঞ্চালনে প্রভাব বিস্তার করে। জলমণ্ডলের হ্রাস-বৃদ্ধি, সমুদ্রস্রোত, বায়ু সঞ্চালনের গতি ও দিক পরিবর্তন ইত্যাদি কারণেও তাপ বিকিরণের হেরফের ঘটে। প্রাকৃতিক এ পরিবর্তনসমূহের কারণে জলবায়ু পরিবর্তিত হতে পারে।

পাঠ ৬.৪

জলবায়ু পরিবর্তনে মনুষ্যসৃষ্ট কারণসমূহ।

জলবায়ু পরিবর্তনে মনুষ্যসৃষ্ট কারণসমূহ চিহ্নিত করতে হলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রাকৃতিক কারণসমূহ বিশেষভাবে চিহ্নিত করা প্রয়োজন। জলবায়ু যে বেশ দ্রুতই পরিবর্তিত হচ্ছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে এ জন্য মানুষ কিভাবে দায়ী তা নিয়ে ভিন্ন মত রয়েছে। মানুষ প্রভাবিত জলবায়ু পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপের কারণে বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাস বৃদ্ধি, বায়ুমণ্ডলে ভাসমান অতিক্ষুদ্র পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি ইত্যাদি।

এ দু'টি বিষয়ই তাপ বিকিরণ বা প্রতিফলনে বাধা সৃষ্টি করছে, ফলে পৃথিবীপৃষ্ঠে স্বাভাবিক তাপ শোষণ ও বিকিরণ প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে এবং ধীর গতিতে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে।

প্রাণী ও পাখি ইত্যাদির বিচরণ ক্ষেত্র হিসাবে সুন্দরবনের বিশেষ নাম রয়েছে। সুন্দরবনের সংরক্ষিত বনাঞ্চলে প্রায় ৩৩০ প্রজাতির বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ পাওয়া যায়। বিশ্বখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রল হরিণসহ প্রায় ৪২ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী, ৩৫ প্রজাতির সরীসৃপ এবং ৯ প্রজাতির উভচর প্রাণী আছে। মদনটাক, হাড়গিলা, দুষ্প্রাপ্য সাদাপেট সমুদ্র ঈগলসহ প্রায় ২৭০ প্রজাতির পাখিও সুন্দরবনে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে প্রায় ১০০ প্রজাতির জলজ পাখি রয়েছে যাদের প্রায় অর্ধেক ভাগ অতিথি পাখি হিসেবে পরিচিত। এরা শীতে এখানে আসে এবং গ্রীষ্মে চলে যায়। চিংড়ির কয়েক'শ প্রজাতির মাছের আবাসস্থল সুন্দরবন। এখানে ২৭ পরিবারভুক্ত প্রায় ৫৩ প্রজাতির সমুদ্রচর মাছ, ৪৯ পরিবারভুক্ত প্রায় ১২৪ প্রজাতির তলদেশবিহারী মাছ, ৫ পরিবারভুক্ত প্রায় ২৪ প্রজাতির চিংড়ি এবং ৮ প্রজাতির গলদা পাওয়া যায়। ৭ প্রজাতির কাঁকড়া ও তিন প্রজাতির কচ্ছপ পাওয়া যায়।

ইতোমধ্যেই বিভিন্ন কারণে সুন্দরবন থেকে অনেক প্রাণী ও গাছ-পালা বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং বর্তমানে বেশ কিছু প্রাণী ও গাছ-পালা বিলুপ্তির পথে।

প্রজাতি	*বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতির সংখ্যা*
উভচর	২
সরীসৃপ	১৪
পাখি	২৫
স্তন্যপায়ী	৫

ইট ভাটা থেকে নির্গত ধোয়া (কার্বন-ডাই-অক্সাইড)

কীটনাশক ব্যবহার

রাসায়নিক সার ব্যবহার

বায়ুমণ্ডলে মিথেনের বৃদ্ধি

১৭৫০ সালের পর থেকে এখন পর্যন্ত পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে শতকরা ১৫০ ভাগ মিথেন বৃদ্ধি পেয়েছে। এই মিথেন গ্যাসের অর্ধেকের কিছু বেশি অংশ মানুষের সৃষ্টি যা কৃষিকাজ, পশুসম্পদ লালন-পালন, প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার ও ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে।

বায়ুমণ্ডলের নাইট্রাস অক্সাইড বৃদ্ধি

প্রাক শিল্প বিপ্লব থেকে এখন পর্যন্ত নাইট্রাস অক্সাইড প্রায় শতকরা ১৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই গ্যাস প্রাকৃতিকভাবে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। তবে মানুষও এজন্য কম দায়ী নয়। প্রধানত: কৃষিকাজ, জ্বালানি হিসেবে জৈব পদার্থের ব্যবহার, কলকারখানার বিভিন্ন ধরনের বর্জ্য, গৃহপালিত পশু ব্যবস্থাপনা এবং জমিতে নাইট্রোজেন সংশ্লিষ্ট সার ব্যবহারের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে এর বৃদ্ধি ঘটে।

বায়ুমণ্ডলে হ্যালোজেনযুক্ত কার্বন যৌগ এবং অন্যান্য গ্যাসের বৃদ্ধি

বায়ুমণ্ডলে হ্যালোজেনযুক্ত কার্বন, যেমন বিভিন্ন ধরনের সিএফসি গ্যাস বৃদ্ধির জন্যে মানুষই দায়ী। তবে ১৯৯০-এর দশকে এসব গ্যাসের কিছু কিছু বায়ুমণ্ডলে যেমন হ্রাস পেয়েছে, তেমনি কিছু কিছু আবার বৃদ্ধিও পাচ্ছে। এছাড়াও ওজন, নাইট্রোজেনের অন্যান্য অক্সাইড গ্যাসসমূহ, কার্বন মনোঅক্সাইড এবং অন্যান্য অনেক গ্যাস পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে গ্রিনহাউস গ্যাস হিসেবে কাজ করে। এদের মধ্যে নাইট্রোজেনের অক্সাইড গ্যাসসমূহ এবং কার্বন মনোঅক্সাইড প্রধানত: মনুষ্য সৃষ্ট।

বায়ুতে ভাসমান অতিক্ষুদ্র পদার্থ দু'ভাবে সূর্য কিরণ বিকিরণে ব্যাঘাত ঘটায় এবং জলবায়ু পরিবর্তনে ভূমিকা রাখতে পারে। এসব অতিক্ষুদ্র কণা বায়ুমণ্ডলে ভেসে থাকে যা সূর্যকিরণ বা তাপকে শোষণ করতে পারে। আবার এ কণাগুলি মেঘের ভৌত উপাদানসমূহের সাথে মিশে মেঘের তাপ বিকিরণ ক্ষমতা ও মেঘের পরিমাণের হেরফের ঘটাতে পারে। মনুষ্যসৃষ্ট এসব ভাসমান অতিক্ষুদ্র কণাসমূহ জ্বালানি হিসেবে খনিজ তেল বা জীবাশ্ম জ্বালানির অসম্পূর্ণ দহন এবং জৈব জ্বালানি বা গাছপালা দহনের ফলে সৃষ্টি হয়। মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপের ফলে বায়ুমণ্ডলে এসব ক্ষুদ্রকণার প্রবেশ অতিরিক্ত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে বায়ুমণ্ডলে এদের স্থায়িত্ব খুবই স্বল্প সময়ের জন্য।

জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যান্য মনুষ্যসৃষ্ট কারণসমূহের মধ্যে–অরণ্য নিধন বা বন উজাড় এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভূমি ক্ষয় ও ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ।

বৃক্ষ নিধন

কল-কারখানা ও গাড়ীর ধোঁয়া
(কার্বন-ডাই-অক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড ইত্যাদি)

পাদটীকা ঃ

গ্রিনহাউস = শীত প্রধান দেশে সব্জি চাষের জন্যে কাঁচ দিয়ে ঘেরা এক ধরনের ঘর তৈরি করা হয় যার ভেতরের উষ্ণতা বাইরের বরফ আচ্ছাদনজনিত ঠাণ্ডা থেকে গাছকে রক্ষা করে।
উৎক্ষেপণ = উপরে প্রক্ষেপণ।
জলমণ্ডল = পানি দ্বারা তৈরি যে আবরণ।
সঞ্চালন = পরিচালন।
মতদ্বৈততা = মতের পার্থক্য।
আপেক্ষিক = কোন কিছুর পরিপ্রেক্ষিতে।

হ্যালোজেন = ক্লোরিন, ফ্লোরিন, ব্রোমিন ও আয়োডিন মৌলকে একসাথে হ্যালোজেন বলা হয়।

জীবাশ্ম জ্বালানি = প্রাণী বা উদ্ভিদের সামগ্রিক বা অংশবিশেষ যা সময়ের বিবর্তনের মাধ্যমে পদার্থের বিভিন্ন অবস্থায় (কঠিন, তরল বা বায়বীয়) রূপান্তরিত হয় এবং ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়। এর মধ্যে কিছু কিছু পদার্থ আমরা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করি যা খনিজ তেল বা জ্বালানি হিসেবে পরিচিত (যেমন জ্বালানি তেল, গ্যাস ইত্যাদি)।

নাতিশীতোষ্ণ = না শীত না গরম

তাপ ধারণ ক্ষমতা = বিভিন্ন পদার্থ বিভিন্ন মাত্রায় তাপ শোষণ করতে পারে। একে বলে তাপ ধারণ ক্ষমতা। পানির তাপ ধারণ ক্ষমতা অত্যন্ত বেশি। কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং সিএফসি প্রচুর পরিমাণে তাপ ধারণ করতে পারে।

অধ্যায় - ৭

জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়াসমূহ

এ অধ্যায়ে আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে যা শিখবো:

ক) জলবায়ু পরিবর্তনের লক্ষণসমূহ চিহ্নিত করা,

খ) বাংলাদেশে এই লক্ষণসমূহের প্রভাব সম্পর্কে ধারণা অর্জন।

পাঠ ৭.১

জলবায়ু পরিবর্তনের লক্ষণসমূহ।

তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত ও বাতাসে জ্বলীয় বাষ্পের পরিমাণ, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ইত্যাদি হ্রাস-বৃদ্ধি হলে বা পরিবর্তিত হলে বুঝতে হবে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে।

গত প্রায় ১০০ বছরেরও বেশি সময়ে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা গড়ে ০.৬° থেকে ০.২° সেঃ বৃদ্ধি পেয়েছে। গত শতাব্দীর (১৯০১ সাল থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত) ৯০-এর দশক (অর্থাৎ ১৯৯০-২০০০ সাল পর্যন্ত) ছিল সবচেয়ে উষ্ণ দশক, যার মধ্যে ১৯৯৮ সাল ছিল সবচাইতে উষ্ণ বছর। গত একশ বছরে নতুন করে পৃথিবীর অনেক অঞ্চলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতোপূর্বে পৃথিবীর যেসব এলাকাকে সর্বাধিক

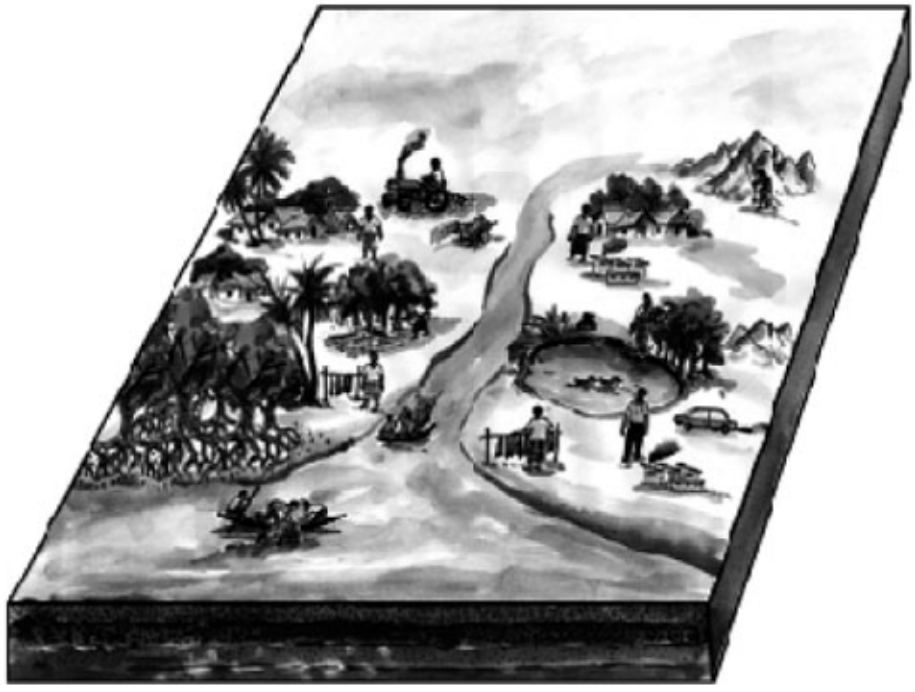

উষ্ণ অঞ্চল হিসেবে বিবেচনা করা হতো সে তুলনায় এখন অনেক নতুন এলাকা আরো বেশি উষ্ণ অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। ১৯৭৯ থেকে ১৯৯৯ সালের মধ্যে সারা পৃথিবীতেই প্রায় সমান হারে উষ্ণতা বেড়েছে।

এশিয়ার পশ্চিমের দেশগুলো ছাড়া উত্তর গোলার্ধের মধ্য ও উচ্চ অক্ষাংশে বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত প্রতি দশ বছরে প্রায় ০.৫ থেকে ১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে ১০° থেকে ৩০° উত্তর অক্ষাংশে প্রতি দশ বছরে প্রায় ০.৩ শতাংশ বৃষ্টিপাত হ্রাস পেয়েছে। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় মহাসমুদ্র অঞ্চলেও বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে ঐসব অঞ্চলের নদীপ্রবাহেরও বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে। ১৯৮০ সাল থেকে এখন পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলে প্রায় ১০ শতাংশ জলীয়বাষ্প বৃদ্ধি পেয়েছে। ভূপৃষ্ঠের উষ্ণতা বৃদ্ধির সাথে বরফ আচ্ছাদন ও বরফের বিস্তৃতি হ্রাসের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। ১৯৬০ সালের পর পৃথিবীর বরফ আচ্ছাদন প্রায় ১০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

নানা কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা পরিবর্তিত হতে পারে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির জন্য জলবায়ু ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণসমূহ অন্যতম। বিংশ শতাব্দীতে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রতি বছরে এক থেকে দুই মিলিমিটার করে বৃদ্ধি পেয়েছে। বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রের পানির সম্প্রসারণ ঘটে, ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। সমুদ্রের পানির পরিমাণ ওঠা-নামার ফলেও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতার তারতম্য ঘটতে পারে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে ভূপৃষ্ঠের বরফ আচ্ছাদন গলে যাওয়ার সম্পর্ক রয়েছে। এছাড়া মাত্রাতিরিক্ত হারে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন, মহাদেশীয় অঞ্চলে বৃহদাকার জলাধার

নির্মাণ, ভূপৃষ্ঠে পানির প্রবাহে বাধা সৃষ্টি, ইত্যাদি সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতায় হেরফের ঘটাতে পারে।

১৯৭০-এর পর পৃথিবীব্যাপী বায়ু সঞ্চালন ও সামুদ্রিক স্রোত সঞ্চালনের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে বছরের উষ্ণকাল বেশি সময় ধরে স্থায়ী হয় এবং মাত্রাও তীব্র হয়।

বিগত বছরগুলোতে কোন কোন অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের তীব্রতা বা কোন কোন অঞ্চলে বৃষ্টিশূন্যতা বৃদ্ধি পায়। এতে বৃষ্টিপাতের সামগ্রিক পরিমাণে তেমন হ্রাস-বৃদ্ধি না ঘটলেও কম সময়ে এর তীব্রতা বা শূন্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের এই লক্ষণসমূহ পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় সামগ্রিকভাবে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পাঠ ৭.২

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের লক্ষণগুলোর প্রভাব।

বিভিন্ন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দেখা গেছে বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকারক প্রভাবসমূহ খুবই তীব্র হতে পারে। সাধারণভাবে সমগ্র দেশের উষ্ণতা ১.৩° সে. থেকে ২.৬° সে. পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে যার ফলে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে এবং বর্ষায় ও শীতে এর মাত্রা বর্তমানের চেয়ে ভিন্নতর হবে। বর্ষায় বৃষ্টিপাত আরো বেড়ে যাবে এবং বৃষ্টিহীন দিনগুলো বা খরা দীর্ঘস্থায়ী হবে। বর্ষায় অধিক বৃষ্টিপাতের ফলে পানিপ্রবাহের পরিমাণ বেশি হবে যার ফলে দেশের অনেক অঞ্চলে বন্যার প্রকোপ তীব্র হবে। অপরদিকে শীতকালে উষ্ণ বায়ুমণ্ডল ও অপর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের ফলে প্রস্বেদন ও বাষ্পীভবন বৃদ্ধি পেতে পারে। তাতে বাতাসে, বিশেষ করে বাংলাদেশের

পশ্চিমাঞ্চলে, জলীয়বাষ্পের ঘাটতি দেখা দেবে। বৃষ্টিহীন দিনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় উজানে পানিপ্রবাহ কমে গেলে উপকূলীয় অঞ্চলে লবণ পানির অনুপ্রবেশ ঘটবে।

সম্প্রতি একটি পরীক্ষামূলক পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ১০ শতাংশ বেড়ে গেলে বাংলাদেশের ২০ শতাংশ ভূমি পানিতে তলিয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে আমাদের কৃষি ব্যবস্থা। ভূমিক্ষয়, মাটির জৈব উপাদান বিনষ্ট, জলীয়বাষ্পের ঘাটতি এবং মরুকরণ ও লবণ পানির অনুপ্রবেশ– সব মিলিয়ে খাদ্যশস্যের বিশেষ করে বোরো ধানের মারাত্মক ক্ষতি হবে। এতে করে দেশের খাদ্যশস্যের সামগ্রিক উৎপাদন বিঘ্নিত হতে পারে। দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের দ্বীপগুলো (উপকূলীয় নিম্নাঞ্চল) সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে তলিয়ে যেতে পারে এবং উপকূলীয় অরক্ষিত অঞ্চলসমূহে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে পারে। নোনা অঞ্চলের লবণাক্ততার মাত্রা বৃদ্ধি ও নতুন নতুন এলাকা লবণাক্ত হতে পারে। শীতকালে বাতাসে জলীয়বাষ্পের ঘাটতি এবং গ্রীষ্মে অতিবন্যার জন্য দেশের অরণ্য বা বননির্ভর প্রতিবেশ বিনষ্ট হতে পারে। শীতে হ্রাসকৃত পানিপ্রবাহ ও লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যানগ্রোভ সুন্দরবনের অস্তিত্ব অত্যন্ত বিপদাপন্ন হতে পারে। তাছাড়া সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলে খাবার পানি সংকট আরো তীব্র হতে পারে।

তাই দেখা যাচ্ছে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে তার ক্ষতিকর প্রভাবগুলো আমাদের দেশে পানি ও কৃষি সম্পদের উপর পড়বে।

পাদটীকা :

উষ্ণায়ন = তাপ বৃদ্ধি পাওয়া।
অবক্ষেপণ = তলানি।
ম্যানগ্রোভ = আর্দ্র গ্রীষ্মমণ্ডলীয় জোয়ার-ভাটা অঞ্চলে লবণাক্ততা সহিষ্ণু বনাঞ্চল।

অধ্যায় - ৮

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া ও খাপখাওয়ানোর কৌশল

এ অধ্যায়ে আমরা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে যা শিখবো :

ক) বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া,

খ) সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়াসমূহ অতিক্রম করা অর্থাৎ, সম্ভাব্য খাপখাওয়ানো বা অভিযোজন প্রক্রিয়া।

পাঠ ৮.১

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়াসমূহ যেভাবে পরিলক্ষিত হতে পারে সেগুলো হলো :

১. সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিজনিত কারণে জলমগ্নতা ও জলাবদ্ধতা সৃষ্টি,

২. ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির ও মাটির লবণাক্ততা বৃদ্ধি,

৩. উপকূলীয় ভৌত প্রক্রিয়াসমূহের তীব্রতা বৃদ্ধি।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অধিকাংশ এলাকা সমুদ্রপৃষ্ঠের তিন থেকে পাঁচ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। যদি কোন কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পায় তাহলে এ অঞ্চলের নিচু এলাকাসমূহ জলমগ্ন

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়তে পারে

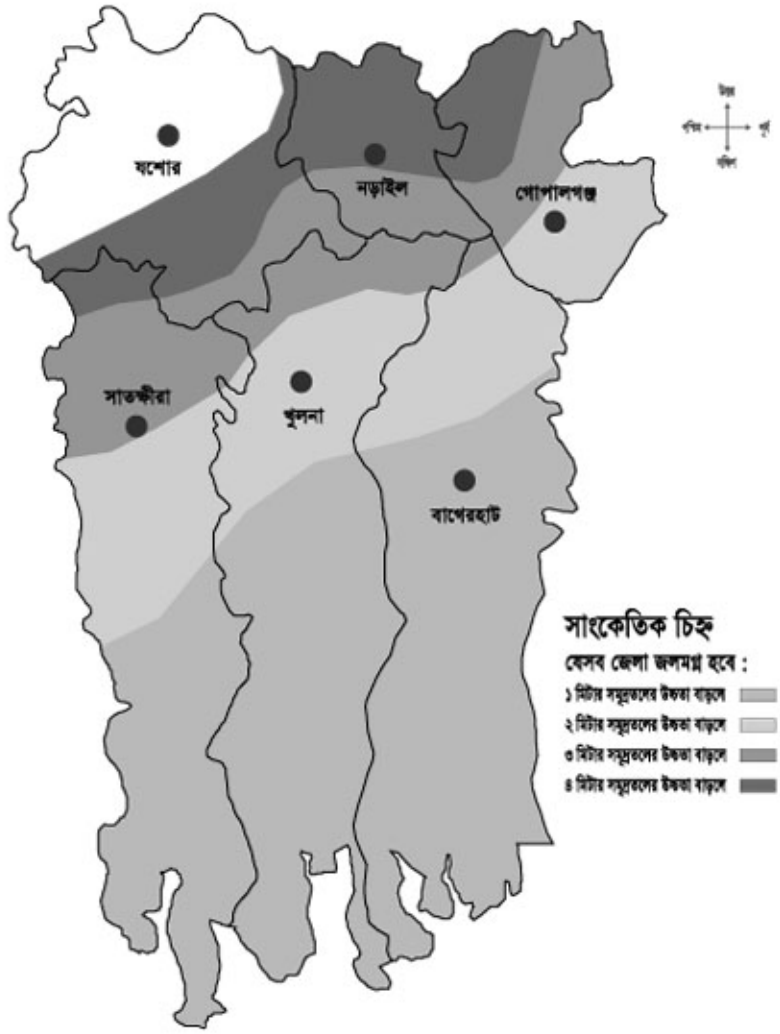

হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে এ অঞ্চলের প্রাকৃতিক জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা অকার্যকর হয়ে যেতে পারে। অন্যদিকে শীতকালে বৃষ্টিপাত ব্যাপকভাবে কমে যাওয়ার কারণে উজানে পানিপ্রবাহ হ্রাস পাবে, ফলে নোনা পানি উপরের দিকে উঠে আসবে এবং নতুন করে বিভিন্ন এলাকায় লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাবে। আবার ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের প্রকোপ বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা বিভিন্নভাবে বিঘ্নিত হতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এই অঞ্চলের কৃষিব্যবস্থা বিপন্ন হতে পারে। একদিকে লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে জমির উর্বরতা হ্রাস পাবে অন্যদিকে কৃষিকাজের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ মিঠা পানির অভাব দেখা দিতে পারে। জোয়ার-ভাটার স্বাভাবিক প্রবাহ বিঘ্নিত হওয়ার কারণে এ অঞ্চলের জল নিষ্কাশনের

পথ সংকুচিত (নদী-খাল শুকিয়ে যাওয়ার কারণে) হয়ে পড়বে, ফলে দীর্ঘমেয়াদী বা স্থায়ী জলবদ্ধতা সৃষ্টি হতে পারে। এতে ধান চাষের উপযোগী জমির পরিমাণ হ্রাস পেতে পারে। তাছাড়া উপকূলীয় ভূমিক্ষয়ের জন্যেও মূল্যবান চাষযোগ্য জমি হ্রাস পেতে পারে।

জলবায়ুর পরিবর্তিত অবস্থায় বর্ষাকালে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে। অতিবৃষ্টির কারণেও নতুন নতুন এলাকা জলাবদ্ধ হতে পারে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির জন্যে পানি দ্রুত সমুদ্রে নিষ্কাশিত হতে পারবে না, ফলে সুন্দরবনের ভিতরেও জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হতে পারে। অপরদিকে শীতকালে অনাবৃষ্টির কারণে বাষ্পীভবন বৃদ্ধির ফলে এ বনাঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। তাহলে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য হ্রাসসহ সুন্দরবনের অস্তিত্বও হুমকির সম্মুখীন হবে। এছাড়া জলোচ্ছ্বাস ও ঝড় বৃদ্ধি পাওয়ার জন্যে মিঠাপানির অঞ্চলে লবণাক্ত পানির জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হতে পারে।

সুন্দরবনের গাছপালা মাটি, ও পানির লবণাক্ততার পরিমাণ প্রাকৃতিকভাবেই নিয়ন্ত্রিত। প্রাকৃতিকভাবে গাছপালার জন্ম, বৃদ্ধি এবং বনায়ন স্তরও এ লবণাক্ততার পরিমাণের উপর নির্ভরশীল। তাই বনাঞ্চলে লবণাক্ততার হ্রাস-বৃদ্ধির জন্যে পুরো বনের সামগ্রিক ক্ষতি হবে, বর্তমান প্রজাতিসমূহ পরিবর্তিত হবে এবং সুন্দরবনের প্রধান বৃক্ষ সুন্দরী গাছ লোপ পেতে পারে, কারণ এই গাছ মিঠা পানি আসক্ত। বন লোপ পাওয়ার সাথে সাথে বনসংশ্লিষ্ট জীববৈচিত্র্য হ্রাস পাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মৎস্যসম্পদ ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। সম্ভাব্য জলবায়ু পরিবর্তনে ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির জন্য পানির উষ্ণতা ও লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেতে পারে। উষ্ণ পানি মাছের প্রজনন প্রক্রিয়ায় প্রভাব ফেলতে পারে। ফলে মাছের বংশ বিস্তার ও চলাচলেও ভিন্নতা আসতে পারে।

সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির জন্যে অনেক চিংড়ি ঘের পানিতে তলিয়ে যেতে পারে এবং ঘের চাষে বিঘ্ন

সৃষ্টি হতে পারে। তাছাড়া মিঠা পানির ঘের চাষও বেশি লবণাক্ততার জন্যে বিপন্ন হতে পারে।

পাঠ ৮.২

সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়াসমূহ অতিক্রম করা, অর্থাৎ সম্ভাব্য খাপখাওয়ানো বা অভিযোজন প্রক্রিয়া

প্রাকৃতিক নিয়মে যখন জলবায়ু পরিবর্তন ঘটে তখন তা ঘটে দীর্ঘ সময় ধরে। জলবায়ু নিজেই একটা দীর্ঘমেয়াদী বিষয়। অন্তত ত্রিশ বছরের আবহাওয়ার স্বরূপকে জলবায়ু বলা হয়। তাই প্রাকৃতিকভাবে পরিবর্তিত জলবায়ুর সাথে খাপখাওয়ানো বা অভিযোজন অনেকটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ঘটে। কিন্তু মানুষ প্রভাবিত জলবায়ু পরিবর্তন ঘটছে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এবং এই পরিবর্তনের সাথে খাপখাওয়ানো বা অভিযোজনও একটি কষ্টকর প্রক্রিয়া হয়ে দাঁড়াবে।

মনুষ্যসৃষ্ট যেসব কারণে জলবায়ু পরিবর্তন দ্রুততর হচ্ছে তার জন্য আমাদের দেশের মানুষ কোনভাবেই দায়ী নয়, অথচ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভয়াবহ দুর্ভোগ পোহাতে হবে আমাদেরই। পৃথিবীর উন্নত ও ধনী দেশসমূহের মানুষ তাদের ভোগবিলাসী জীবনযাপনের কারণে মাত্রাতিরিক্ত গ্রিনহাউস গ্যাস উদ্‌গীরণ ঘটছে। গ্রিনহাউস গ্যাস বৃদ্ধির উৎসমূলে রয়েছে পৃথিবীর শিল্পোন্নত দেশগুলো এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয়ভাবে আমাদের করার তেমন কিছুই নেই। তাই জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকারক প্রভাবসমূহ

মোকাবেলার জন্য আমাদের খাপখাওয়ানো বা অভিযোজন কৌশল নির্ধারণ করা জরুরী হয়ে পড়েছে।

সম্ভাব্য অভিযোজনসমূহ হতে পারে বিভিন্নভাবে, যেমন :

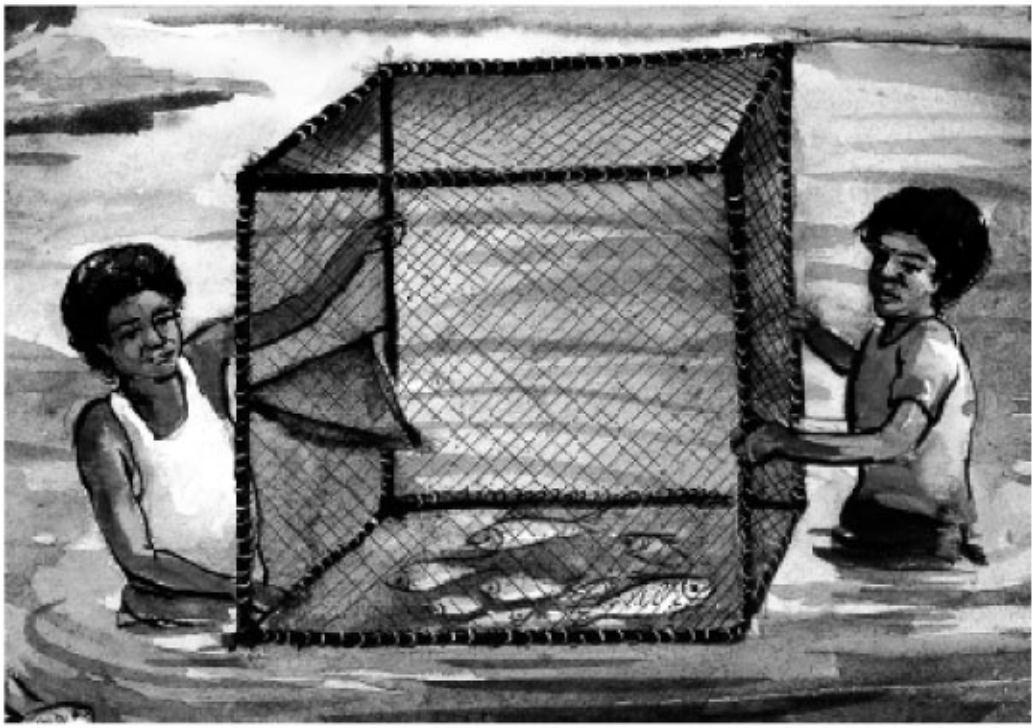

ক. ক্ষতি মেনে নেয়ার মাধ্যমে

খ. বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ক্ষতি ভাগাভাগির মাধ্যমে

গ. আসন্ন ক্ষতির সম্ভাবনাগুলোকে বিভিন্ন সতর্কতামূলক পন্থায় নিবৃত্ত করার মাধ্যমে, যেমন– শস্য উৎপাদনে বিকল্প পন্থা নির্ধারণ

ঘ. নেতিবাচক প্রভাবসমূহকে রহিত করার মাধ্যমে, যেমন– বৃহদাকার বাঁধ নির্মাণ

ঙ. সম্পদের পরিবর্তিত ব্যবহারের মাধ্যমে, যেমন– ধান চাষ থেকে মৎস্য চাষ

চ. নতুন আবাস স্থানান্তরের মাধ্যমে।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থান, জনাকীর্ণতা, দরিদ্রতা, ভূমি বৃদ্ধির সম্ভাব্যতা এবং অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োজনের নিরিখে এই অভিযোজন প্রক্রিয়াগুলো যাচাই করতে হবে।

এখানে কয়েকটি সম্ভাব্য জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব এবং অভিযোজন পন্থা উল্লেখ করা হলো :

ক. ক্ষেত্র : মিঠা পানির প্রাপ্যতা।

প্রভাব : অনিয়মিত মিঠা পানির প্রাপ্যতা, লোনা পানির অনুপ্রবেশ, মিঠা পানির মৎস্য উৎপাদন হ্রাস, বন্যার তীব্রতা বৃদ্ধি।

অভিযোজন : প্রাকৃতিক জল নিষ্কাশন ব্যবস্থায় সার্বিক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, মৃদু ও অতিলবণাক্ত পানির মৎস্য উৎপাদন এবং নদীপ্রবাহে সাবলীলতার জন্য উপযুক্ত নদী ব্যবস্থাপনা।

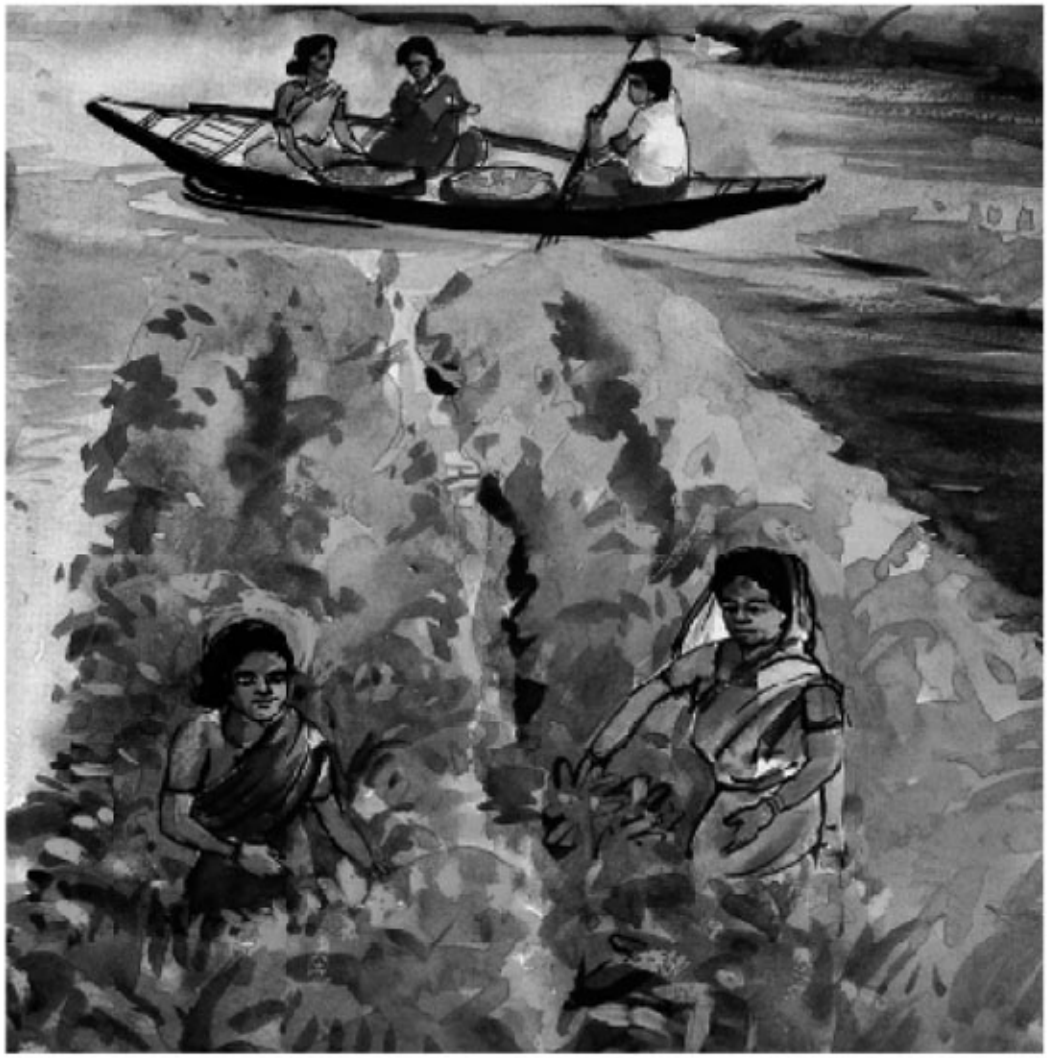

খ. ক্ষেত্র : উপকূলীয় সম্পদ।

প্রভাব : লবণাক্ততা বৃদ্ধি, জলমগ্ন জলাবদ্ধ এলাকার বৃদ্ধি।

অভিযোজন : জল সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রবর্তন, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা।

গ. ক্ষেত্র : প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

প্রভাব : বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস বৃদ্ধি।

অভিযোজন : খাদ্য ও সম্পদ রক্ষার জন্যে ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছ্বাস ও বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, ঝড়-বন্যা মোকাবিলা করতে পারে স্বল্পব্যয়ে এমন গৃহ নির্মাণ, গৃহপালিত পশুর জন্যে উঁচু পাটাতন নির্মাণ, পূর্বাভাস ব্যবস্থার উন্নতি এবং দুর্যোগ-পূর্ব ও দুর্যোগ-পরবর্তী অবস্থার প্রস্তুতি।

প্রভাব : লবণাক্ততা বৃদ্ধি বা সেচের জন্য মিঠা পানি দুষ্প্রাপ্যতার ফলে উৎপাদন হ্রাস।

অভিযোজন ঃ শস্যে বৈচিত্র্য আনা, লবণসহিষ্ণু শস্য উৎপাদন, জলাবদ্ধ এলাকায় ধাপের উপর চাষ (ভাসমান চাষ) পদ্ধতির প্রবর্তন, কৃষকদের নতুন অবস্থায় অভিযোজনে সমর্থ করা, প্রশিক্ষণ দেওয়া। উল্লেখ্য, দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের গোপালগঞ্জ, পিরোজপুর জেলায় দীর্ঘদিন থেকে ভাসমান চাষ বা ধাপের উপর চাষ পদ্ধতি প্রচলিত আছে। অন্যান্য জলাবদ্ধ এলাকায় এই পদ্ধতিতে চাষ করা যেতে পারে।

ঙ. ক্ষেত্র : বন।

প্রভাব : বনসম্পদ হ্রাস, সংশ্লিষ্ট প্রাণী সম্পদের ঘাটতি।

অভিযোজন : উপকূলীয় বনায়ন ত্বরান্বিত করা, লবণসহিষ্ণু উদ্ভিদের দ্বারা বনায়ন, বিদেশী প্রজাতির উদ্ভিদের অনুপ্রবেশ নিরুৎসাহিত করা এবং সুন্দরবন সংরক্ষণসহ প্রতিবেশে সংবেদনশীল বনাঞ্চলের ব্যবস্থাপনা।

চ. ক্ষেত্র : মৎস্য।

প্রভাব : মিঠাপানির মৎস্য সম্পদ হ্রাস।

অভিযোজন : উজানে মিঠা পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করা, নদী-খাল দখলমুক্ত করা, নদী-খালের পলি অপসারণ করা, লবণসহিষ্ণু মাছ চাষ বৃদ্ধি করা, মৎস্য খামার বৃদ্ধি করা, মাছের অতি-আহরণ নিরুৎসাহিত করা, মাছের পোনা সংরক্ষণ, মাছের প্রজনন ক্ষেত্র শিকারের আওতামুক্ত রাখা, ধানের সাথে মাছ চাষ, রাসায়নিক সার-কীটনাশক ছাড়া চাষ পদ্ধতির প্রবর্তন, এবং পানি দূষণ রোধ করা।

ছ. ক্ষেত্র : স্বাস্থ্য।

প্রভাব : পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব।

অভিযোজন : পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করা, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যায় সচেতন হওয়া, নালা-ডোবা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, জল নিষ্কাশন উন্নত করা এবং জনস্বাস্থ্য ও উন্নত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে সচেষ্ট হাওয়া।

পাদটীকা :

পললায়ণ = পলল জমা হওয়ার পদ্ধতি।

অভিপ্রয়াণ = জীবন ও প্রজননের অনুকূল পরিবেশের জন্যে জীবের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলাচল।

নিবৃত্ত = রোধ করা বা দমিয়ে রাখা।

IUCN-Bangladesh (2001) *The Bangladesh Sundarbans : a photoreal sojourn*. IUCN Bangladesh Country Office, Dhaka

Khan, MS, Huq, E., Huq, S., Rahman, A. A., Rashid, S.M.A. and Ahmed, H. (Eds) (1994) *Wetlands of Bangladesh Bangladesh Centre for Advanced Studies* (BCAS), Dhaka

Khan, M.H and Fitzcharles, K. (1998) *Environmental Management Field Handbook for Rural Road Improvement Projects* CARE Bangladesh

Kothari, A. (1997) *Understanding Biodiversity : Life Sustainability and equity,* Orient Longman

McCarthy, J.J., Canziani, O.F., Leary, N.A., Dokken, D.J. and White, K.S. (Eds) (2001) *Climate Change 2001 : Impacts, Adaptation and Vulnerability* (Contribution of working group II to the third assessment repot of the Intergovernmental panel on climate change). Cambridge University Press, Bangladesh.

Odum, E.P. (1996) *Fundamentals of Ecology*. Natraj Publishers Dehra Dun, India

Rashid, H-er. (1991) *Geography of Bangladesh*. The University Press Limited, Dhaka

Reimann, K.U. (1993) *Geology of Bangladesh*. Gebruder Borntraeger, Berlin

Subramanian, V. (2002) *A Textbook In Environmental Science*. Narosa Publishing House, New Delhi

Saha, S.K. and Schaerer, C. (2002) *Report on Community Vulnerability Assessment in southwest Bangladesh* CARE-Bangladesh

সুন্দরবন ষ্ট্যাডি গ্রুপ, *তেল-গ্যাস ঃ সুন্দরবনের ঐতিহ্য বনাম উন্নয়ন*, রূপান্তর, খুলনা

W'o Okot-Uma, R. and Odiachi, R.M.R. (Eds) (1999) *Biodiversity and Gender for Sustainable Development*. Commonwealth Secretariat and SFI Publishing

World Bank (2000) *Bangladesh : Climate change and sustaiable development*. Report No 21104-BD, Documents of the World Bank.

IUCN-Bangladesh (2001) *The Bangladesh Sundarbans : a photoreal sojourn*. IUCN Bangladesh Country Office, Dhaka

Khan, MS, Huq, E., Huq, S., Rahman, A. A., Rashid, S.M.A. and Ahmed, H. (Eds) (1994) *Wetlands of Bangladesh Bangladesh Centre for Advanced Studies* (BCAS), Dhaka

Khan, M.H and Fitzcharles, K. (1998) *Environmental Management Field Handbook for Rural Road Improvement Projects* CARE Bangladesh

Kothari, A. (1997) *Understanding Biodiversity : Life Sustainability and equity,* Orient Longman

McCarthy, J.J., Canziani, O.F., Leary, N.A., Dokken, D.J. and White, K.S. (Eds) (2001) *Climate Change 2001 : Impacts, Adaptation and Vulnerability* (Contribution of working group II to the third assessment repot of the Intergovernmental panel on climate change). Cambridge University Press, Bangladesh.

Odum, E.P. (1996) *Fundamentals of Ecology*. Natraj Publishers Dehra Dun, India

Rashid, H-er. (1991) *Geography of Bangladesh*. The University Press Limited, Dhaka

Reimann, K.U. (1993) *Geology of Bangladesh*. Gebruder Borntraeger, Berlin

Subramanian, V. (2002) *A Textbook In Environmental Science*. Narosa Publishing House, New Delhi

Saha, S.K. and Schaerer, C. (2002) *Report on Community Vulnerability Assessment in southwest Bangladesh* CARE-Bangladesh

সুন্দরবন ষ্ট্যাডি গ্রুপ, *তেল-গ্যাস ঃ সুন্দরবনের ঐতিহ্য বনাম উন্নয়ন*, রূপান্তর, খুলনা

W'o Okot-Uma, R. and Odiachi, R.M.R. (Eds) (1999) *Biodiversity and Gender for Sustainable Development*. Commonwealth Secretariat and SFI Publishing

World Bank (2000) *Bangladesh : Climate change and sustaiable development*. Report No 21104-BD, Documents of the World Bank.

স্কুল পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম পরিচিতি-

কার্যক্রমের লক্ষ্য : জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষিত করার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা ও প্রাথমিক ধারণা প্রদান।

কার্যক্রমের উদ্দেশ্য : জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকদের জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণ ও পূর্বানুমান সম্পর্কে ধারণা অর্জন এবং মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ের পাঠ্যসূচিতে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে পাঠ সংযোজনের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের জন্য প্রস্তাবনা প্রণয়ন।

কর্ম এলাকা : খুলনা জেলার দাকোপ, যশোর জেলার কেশবপুর, নড়াইল জেলার কালিয়া, বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ ও শরণখোলা উপজেলার মোট ৬৫টি মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুল।

যাদের জন্য : এ্যাওসেড (AOSED) নির্বাচিত ১৫টি ও ডাক দিয়ে যাই (DDJ) নির্বাচিত ৫০টি মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুলের ১৫,৫০০ ছাত্র-ছাত্রী, ৮০জন শিক্ষক, স্কুলসমূহের পরিচালনা কমিটি ও উপজেলা পর্যায়ের শিক্ষক নেতৃবৃন্দ।

কর্ম পদ্ধতি : শিক্ষক প্রশিক্ষণ মডিউল, ছাত্র/ছাত্রীদের সহজ পাঠ্য পুস্তিকা (৬ষ্ঠ-৭ম শ্রেণী ও ৮ম-৯ম শ্রেণীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন দুটি সহজ পাঠ্য পুস্তিকা), ফ্লিপ চার্ট এবং শিক্ষক সহায়িকা (শিক্ষা উপকরণসমূহ) এ্যাওসেড (AOSED) প্রণয়ন করে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ : এ্যাওসেড (AOSED)-এর কর্মএলাকায় ১৫টি ও ডাক দিয়ে যাই (DDJ)-এর কর্মএলাকায় ৫০টি স্কুলের ৮০জন শিক্ষককে ২ দিন ব্যাপী আবাসিক প্রশিক্ষণ ও প্রকল্পের মেয়াদকালীন সময় প্রশিক্ষিত শিক্ষকদের থানা পর্যায় ১টি রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

স্কুল পর্যায়ে কার্যক্রম : নির্বাচিত স্কুলসমূহের ৬ষ্ঠ-৯ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতিটি ক্লাসে শিক্ষাবর্ষের মধ্যে ৮টি সেশনে পাঠদান ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

care AOSED CIDA

Implemented by AOSED
In Partnership with CARE Bangladesh RVCC Project
Financed by Canadian International Development Agency (CIDA)

AOSED 35, Basupara Road, Khulna-9100, Bangladesh. Phone : +880-41-813574, E-mail : aosed_khulna@yahoo.com